ভোর হতেই আবার সৈন্যদের মধ্যে খোঁজা খুঁজির ধুম পড়ে গেল। বাড়ীতে কিছু সন্ধান না পেয়ে সারাদিন সমস্ত গ্রামটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াল কিন্তু সার রালফের কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না। তখন একেবারে নিরাশ হয়ে দলপতি বাড়ীতে জনকয়েক প্রহরী রেখে সন্ধ্যার সময় চলে গেলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর আবার চারজন লোক এসে উপস্থিত। এরাও ক্রমওয়েলেরই লোক। তাদের মধ্যে সর্দ্দার যে, সে একটা টেবিলের পাশে বসে মেয়েদের এনে সার রালফ্ সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল। লেডি রালফ্ একেবারে নিরুত্তর একটি কথারও উত্তর দিলেন না, এদিকে আণ্ট্ বেসিও যেন হঠাৎ কালা বোবা হয়ে পড়লেন।

সর্দ্দারের পাশেই যে লোকটি বসে ছিল সে তখন বল্ল—"আরে মশাই! আমরা বোধ হয় ভূতের বেগার খাট্তে এসেছি। সার রালফ্ কি এমনই বোকা যে আমাদের জন্য এখানে এসে লুকিয়ে থাক্বে।" তখন আর একটি লোক ফিস্ ফিস্ করে সর্দ্দারের কাণে কি জানি বল্ল আর তিনিও মেয়েদের একটু সরে দাঁড়াতে বলে চার্লস্‌কে ডাক্লেন —"এস ত হে ছোক্রা! টেবিলের সাম্‌নে এই টুলটাতে দাঁড়িয়ে আমার কথার উত্তর দাও। আচ্ছা! তোমার নাম কি বল দেখি?" পরিষ্কার গলায় উত্তর হলো—"আমার নাম চার্লস্ পেল্‌হাম্।"

"আচ্ছা, চার্লস্! বল দেখি তোমার বাবাকে তুমি শেষ কবে দেখেছ? ঠিক করে সত্যি কথা বল।"

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনে চার্লস্ একটু থমমত খেয়ে গেল। বাড়ীর মেয়েদের প্রাণ কেঁপে উঠ্ল পাছে সে সব কথা বলে দেয়—তা হলেইত সর্ব্বনাশ! আবার প্রশ্ন হলো। তখন চার্লস্ নির্ভয়ে উত্তর করল—"অনেক দিন হলো বাবা রাজার হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। আমি যদি বড় হতাম তাহলে আমিও রাজার দলে যুদ্ধ করতাম।"

চার্লসের উত্তর শুনে সর্দ্দার ভারী আমোদ পেয়ে বল্ল—"তাই নাকি? কেন, রাজার হয়ে যুদ্ধ করবে কেন?" নির্ভয়ে বুক টান করে চার্লস্ উত্তর দিল—"কেন করব না? আমি যে পেল্‌হাম্—পেল্‌হাম্ পরিবারের লোকেরা চিরকালই রাজভক্ত, তারা রাজার হয়েই যুদ্ধ করে।"

ছোট শিশুর মুখে এমন উত্তর শুনে সর্দ্দারের মন গলে গেল, তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে চার্লস্‌কে বল্লেন—"সাবাস্ বাচ্চা! তোমার মত সাহসী ছেলের বাবা যে আমাদের

ফাঁকি দিয়ে পালাতে পেরেছেন তাতে আমি একটুও দুঃখিত নই।" এই কথা বলেই তিনি সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেলেন—কেমুর হল আবার নিরাপদ হলো।

ইহার বছর কয়েক পরেই যুবরাজ চার্লস্ "দ্বিতীয় চার্লস্" নামে ইংলণ্ডের রাজা হলেন। তখন সার রালফ্ নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরলেন। বালক পেল্‌হামের সাহসের কথা রাজার কাণেও পৌঁছেছিল, তিনি এই তেজী ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কত আদর করেছিলেন। পেল্‌হাম্ বংশ এখনও কেমুর হলে বাস করেন। এখনও সেখানে গেলে এই বালক বীরের সুন্দর ছবি দেখতে পাবে।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

মই ভূত।

বন্দীপুরে জেলেদের এক ষণ্ডামার্ক ছেলে ছিল—তাহার নাম গণেশচন্দ্র। রাত-ভিতে উঠিয়া চোর ছ্যাঁচোড় তাড়াইতে তাহার মতন বড় একটা কেউ সে গ্রামে ছিল না। একদিন কতকগুলা নিষ্কর্ম্মা গাঁজাখোর আড্ডায় বসিয়া তর্ক করিতেছিল—"কেউ ভূত দেখিয়াছ কি না।" কেহ বলিল—"হাঁ দেখিয়াছি।" কেহ বলিল—"ভূত দেখা যায় না, কেবল একটা হাওয়া মাত্র।" একজন বলিল ভূত নিশ্চয়ই আছে—কারণ, তার বাড়ীওয়ালার জামাইয়ের পিশতুতো ভাই নাকি স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছে! আবার কেহ বলিল—"ভূত বড় ভয়ানক জিনিষ, ঘাড়ের রক্ত চুষিয়া খায়।" জেলেদের গণেশচন্দ্র রাস্তায় দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিয়া উঁকি মারিয়া একবার তার্কিক মহাশয়দের দেখিয়া লইল এবং মনে মনে বলিল—"ভূত না দেখিলে ইহাদিগের ঘাড়ের ভূত ছাড়িবে না।"

তখন শুক্ল পক্ষ। বন্দীপুরের মাঠে ঘাটে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, লোকজন চলাফেরা করিলে বেশ স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় দিবসে রাত্রি বারটার পর বন্দীপুরে এক ভীষণ কাণ্ড ঘটিল। গ্রামের লোকজন শুনিতে পাইল কে একজন ভয়ানক স্বরে রাস্তার উপর দিয়া কাঁদিয়া চলিয়া যাইতেছে। এম্‌নি করিয়া আরও দুই দিবস কাটিল; চাষামহলে বাবুমহলে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, এই কান্নার কথা চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল।

একদিন তাল ঠুকিয়া কয়েকজন এই ব্যাপার দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। যথা সময়ে তাহারা সেই স্বর শুনিতে পাইয়া খুব সাবধানে দল বাঁধিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে স্বর যখন আরও নিকটবর্ত্তী হইল, জ্যোৎস্নার আলোকে তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইল প্রায় চৌদ্দ হাত লম্বা একটা ভয়ানক মুর্ত্তি কঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিতেছে। তখন সকলেরই আত্মারাম প্রায় খাঁচাছাড়া হইয়া গিয়াছিল। মুর্ত্তিটা তাদের সম্মুখ দিয়া বিকট কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া অনেক দূরে চলিয়া গেল। তখন সকলেরই ধড়ে প্রাণ আসিল, তাহারা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"এ নিশ্চয়ই ভূত; এক রকম উড়ো ভূত আছে—এ সেই জাতের;"—শুনিয়া সকলেই সকলেই হাঁ হাঁ করিয়া সায় দিয়া বলিল "এক রকম কান্না ভূত আছে—তারা কেঁদে কেঁদেই বেড়ায়।" অবশেষে "দুর্গা দুর্গা—রাম রাম" বলিয়া যে যাহার বাড়ী ফিরিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পরদিন সকাল হইতে না হইতেই কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেল। একজন আড্ডাধারী বলিয়া উঠিল—"ভাই ভূততো তা'হ'লে আছে?" অপর একজন বলিল—"নিশ্চয় আছে, খুব আছে; অমন চৌদ্দ হাত ভূত দেখলুম, আর নেই বলি কেমন ক'রে বল?" যাহারা "ভূত নাই" বলিয়াছিল, তাহারা "চৌদ্দ হাত বাবাজি"র উদ্দেশে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধ পালোয়ান লক্ষ্মণ সর্দ্দার সেখানে বসিয়াছিল, সে সেই কথা শুনিয়া বলিল— "বটে, তোমরা ভূত দেখিয়াছ? আমি একবার দেখিতাম তবে এক আঁচড়েই বুঝিয়া লইতাম সে কোন্ জাতীয় ভূত।" সর্দ্দারের কথা শুনিয়া একজন বলিল—"তামাসা নয় সর্দ্দার খুড়ো, সে কান্না শুন্‌লে তোমারও বুক কেঁপে উঠতো।"

সর্দ্দার খুড়ো আড্ডাঘরের তক্তপোষের উপর প্রচণ্ড এক চড় মারিয়া বলিয়া উঠিল—"আরে থো করনা! ও ব্যবসা আমরা বহুদিন ক'রেছি। ভূত থেকে থাকতে থাক্‌তে ক্রমে আজ সর্দ্দার হ'য়েছি। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে একজন আজ রাত্রে আমার সঙ্গে চল, সে কত বড় চৌদ্দ হাত ভূত—একবার দেখে নেব"।

সেইরূপই ব্যবস্থা হইল। চৌদ্দ হাত ভূত যে রাস্তা দিয়া কাঁদিয়া যাইত, সেই রাস্তার উপর দুইটি পিটুলী গাছ ছিল; সর্দ্দার রাত্রি বারটার কিছু পূর্ব্বে গ্রামের এক পালোয়ানকে সঙ্গে লইয়া তাহারই নীচে উপস্থিত হইল এবং তাহার সঙ্গীকে বলিল—"শ্যামসুন্দর! তুমি একটায় ওঠ, আমি একটায় উঠি; দেখি, আজ ভূতের পো কত কাঁদতে পারেন।"

সর্দ্দার ও শ্যামসুন্দর গাছে উঠিয়া বসিল এবং মজা দেখিবার জন্য ঝোপে-ঝাপে আরও কয়েকজন লুকাইয়া রহিল। রাত দুপুরের সময় হঠাৎ সেই কান্নার সুর উঠিল, সকলেরই দৃষ্টি অমনি সেই দিকে ছুটিল। বাস্তবিকই তখন সাদা ধপ্‌ধপে একটি চৌদ্দ হাত ভূত যেন ডানা মেলিয়া উড়িয়া আসিতেছিল। সেই চেহারা আর সেই ভয়ানক ক্রন্দনের সুর শুনিয়া সর্দ্দার খুড়োরও প্রাণটা একবার ছাঁত্ করিয়া উঠিল। আবার সেই মুহূর্ত্তেই সাহসে বুক বাঁধিয়া ভূত ধরিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে ভূত শ্যামসুন্দরের গাছের নীচে আসিয়া হাজির।

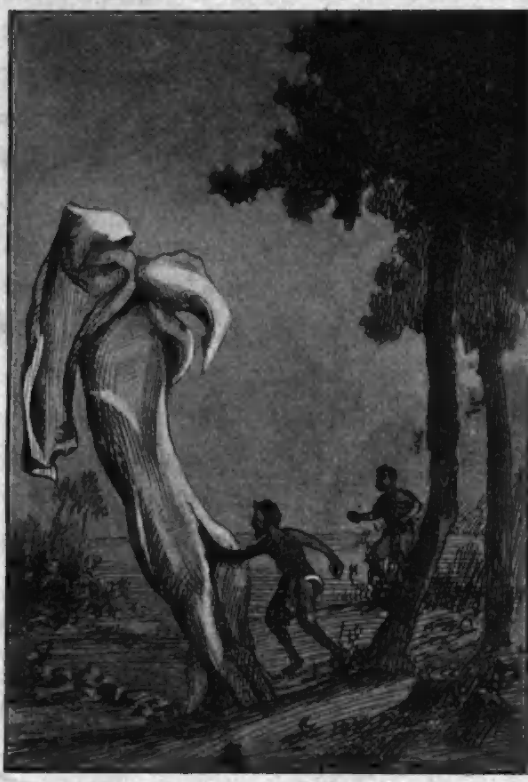

শ্যামসুন্দর ভাবিয়াছিল ভূত আসিতেই সে লাফাইয়া পড়িবে কিন্তু ভূতের চেহারা দেখিয়া তাহার সাহসে কুলাইল না। সে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তারপর সর্দ্দার খুড়োর পালা আসিল। যেমন ভূতের আগমন অমনি তাহার উপর সর্দ্দার খুড়ার পতন; সঙ্গে সঙ্গে ভূতের কান্না একেবারে দেশছাড়িয়া পলায়ন করিল। তখন শ্যামসুন্দরও একটু সাহসে ভর করিয়া নীচে আসিয়া ভূতকে পাকড়াও করিল। সর্দ্দার খুড়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"তুই কোন্ জাতের ভূত?"

ভূত বলিল "আঁমি কাঁন্না ভূঁত; হুঁ—হুঁ—ধঁরে নোঁবোঁ।"

"এই যে ধরাচ্ছি" বলিয়া সর্দ্দার ভূতকে একটি বিরাশী সিক্কা ওজনের চপেটাঘাত করিল; শ্যামসুন্দরও দেখাদেখি কাঁপিতে কাঁপিতে একটি ঘুঁসি ঝাড়িল। তখন ভূতটা

ভাঙ্গিয়া পড়িল—অর্থাৎ কাপড়ে ঢাকা একখানা মই মাটিতে পড়িয়া গেল আর তাহার মধ্য হইতে জেলেদের গণেশচন্দ্র বাহির হইয়া পড়িল। সর্দ্দার তাহার কাণ ধরিয়া বলিল—"কি রে গণেশ? তুই এসেছিস্ আমার ওপর চালাকি ক'রতে? জানিস্ আমি এখনও গ্রাম ছেড়ে যাইনি? বড্ড বেঁচে গেছিস্! আর একটু হ'লেই এই কাটারি ছুঁড়ে মাথাটা দোফাঁক ক'রে দিতুম।" ব্যাপার দেখিয়া ঝোপের মধ্য হইতে হৈ হৈ করিয়া কয়েকজন লোক গনেশচন্দ্রকে প্রহার করিতে উঠিল। সর্দ্দার সকলকে নিষেধ করিয়া বলিল—"খবরদার ভূতের গায়ে কেউ হাত তুলো না; এ আমাদের চেনা ভূত—ঘরের ভূত। এগিয়ে আয়, ভূতের মুখখানা দেখে খুসী হ'বি"।

সর্দ্দারের কথায় সকলেই ভূতের মুখ দেখিতে আসিল। দেখিয়াই সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"ওরে, এ যে পদ্মজেলের ছেলে গণেশচন্দ্র রে!" সর্দ্দারও বলিয়া উঠিল—"হাঁ—হাঁ, এ তোদের ভূত। যাক্ দেখ্‌দেখি, কাপড় ঢাকা ও জিনিষটা প'ড়ে গেল কি?"

সকলে কাপড়ের প্যাঁচ খুলিয়া দেখিল প্রকাণ্ড একটা মই। হাসিতে হাসিতে সকলের নাড়ী ছিঁড়িবার উপক্রম হইল। সর্দ্দারও একটু হাসিয়া বলিল—"কেমন, তোরা এই ভূত দেখেছিলি তো? বলিহারী তোদের বুদ্ধিকে আর তোদের সাহসকে।"

জেলেদের গণেশচন্দ্র মাথা চুলকাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"সর্দ্দার খুড়ো! দু' একটা কিল চড় যা মেরেছ সেগুলো আমার ভাল লাগেনি; কিন্তু এই লোক ক'টার ভূতের ভয় দূর হ'ল দেখে বড়ই খুসী হ'লুম।" সর্দ্দার আবার বলিল—"এখনও যদি তোরা ভূতের ভয় রাখিস্ তবে নূতন করে জেনে রাখ্, এও এক রকম ভূত বটে—দুনিয়ায় "মইভূত" ব'লে এক জাতীয় ভূত আছে।"

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—

১। গণ্ডার ২। বাতাস ৩। পাখা

পুরাতন লেখা।

৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।
জন্ম—২৮শে বৈশাখ ১২৭০।
মৃত্যু—৪ঠা পৌষ ১৩২২।

[যাঁহার ছবি এখানে দেওয়া হইল "সন্দেশে"র পাঠক পাঠিকাদের কাছে তাঁহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। বাংলাদেশের শিশুদের কাছে তিনি সুপরিচিত। জীবনে তিনি অনেক কাজই করিয়া গিয়াছেন, কারণ তিনি একাধারে সাধক শিল্পী কবি ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। নানা সাধনার মধ্যে তিনি নিজে যে আনন্দ পাইতেন তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে কথায় বার্ত্তায় লেখায় বক্তৃতায় তিনি সেই আনন্দ অজস্র বিতরণ করিতেন। বিশেষত শিশুদের কাছে তাঁহার আনন্দের ভাণ্ডার একেবারে অফুরন্ত ছিল। সেই জন্যই শেষ জীবনে যখন তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, যখন আর কাজ করিবার শক্তি রহিল না, তখনও তিনি শিশুদের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তখন তিনি এই "সন্দেশ" বাহির করিয়া নানারকম লেখা ও ছবি দিয়া তাহাদের জন্য নূতন আনন্দের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বহু দিন হইতেই "সখা" "সাথী" "মুকুল" প্রভৃতি কাগজে তিনি ছেলেদের জন্য লিখিয়া আসিতেছেন—সে সকল লেখা এতদিনে প্রায় লোপ পাইতে চলিল। আমরা সেই সকল পুরাতন লেখা সংগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে সন্দেশে ছাপিব, স্থির করিয়াছি। সে সময়ে যাঁহারা শিশু ছিলেন তাঁহারা এই সকল লেখা পড়িয়া কত আনন্দ পাইতেন সে কথা তাঁহাদের মুখেই আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। ১১ বৎসর আগে তিনি পুরী গিয়াছিলেন সেই সময়কার লেখা হইতে আমরা একটু একটু তুলিয়া দিলাম।]—

হাঁটিয়া শ্রীক্ষেত্র যাইবার সেই পুরাণো পথ রেল হইতে বার বার দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিবার যে উহাতে এমন বিশেষ কিছু আছে, তাহা নহে। আমাদের দেশী বিশ্রী-গোছের পাকা রাস্তা যেমন হইয়া থাকে, এও সেইরূপ। তোমরা দেখিলে উহাকে কিছুমাত্র ভাল বলিবে না। তথাপি আমি উহাকে বার বার দেখিয়াও ক্লান্ত হই নাই। আমার যে বড়ই সুন্দর লাগিয়াছিল, তাহা নহে; কিন্তু ঐ পথটাকে দেখিয়া আমার ছেলেবেলার অনেক কথা মনে হইতেছিল। ঐ পথ দিয়া কত লোক শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছেন। ছেলে বেলা তাঁহাদের অনেকের মুখে এই পথের বর্ণনা শুনিয়াছি। মাথা ফাটান রৌদ্রের মধ্যে তপ্ত কাঁকরের উপর দিয়া পথ চলা। পা ফুলিয়া যায়, তাহার তলা ফাটিয়া যায়, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তথাপি উৎসাহের ত্রুটি নাই। পুরুষদের চাইতে স্ত্রীলোকদেরই উৎসাহ বেশী। একটি বৃদ্ধা গ্রামের কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রসাদ, জগন্নাথের ছবি, সমুদ্রের ফেণা, হোগলার ঠোঙ্গা, হোগলার পাখা প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য্য জিনিস লইয়া দেশে ফিরিলে পর বহুদিন পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করিতে দিইনাই। জগন্নাথের চেহারা কেন ওরূপ হইল? সুভদ্রা ঠাক্‌রুণ ভাইদের মাঝখানে এমন জড়সড় হইয়া আছেন কেন? কালাপাহাড় কি রকম ভয়ানক লোক ছিল? ইত্যাদি কথা শুনিতে শুনিতে আমাদের মুখের হাঁ আর চোখ ক্রমে গোলাকার হইয়া উঠিত! আর শেষকালে সেই বৃদ্ধা যখন '——' ঠাকুর ফুলা পায় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কিরূপ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার অভিনয় করিয়া দেখাইতেন, তখন ব্যাপার যাহা হইত, সে আর কি বলিব!

সেই '——' ঠাকুর এই পথে শ্রীক্ষেত্র গিয়াছিলেন। এই পথে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু তথাপি কিরূপ করিয়া তিনি এই পথে গিয়াছিলেন তাহা যেন স্পষ্ট মনে হইতেছিল।

আর মনে হইতেছিল, সেই বুড়ো উড়ে পাণ্ডাটির কথা, শিশুকালে যাঁহার সহাস্য মুখখানি দেখিলে আমরা কতই আনন্দিত হইতাম। পাণ্ডার নিজের সম্বন্ধে এমন বিশেষ সংবাদ আমরা কিছু জানিতাম না যাহাতে তাঁহাকে দেখিলে আমাদের ভারি সুখ হইবার কথা। কিন্তু তাঁহার একটি আশ্চর্য্য লম্বা থলে ছিল, আর সেই থলের ভিতরে নানা রকমের সুমিষ্ট 'প্রসাদ' থাকিত! সেই থলে অথবা তাহার ভিতরকার প্রসাদের খাতিরেই শিশুকাল হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার কথা মনে করিয়া রাখিয়াছি। সেই

প্রসাদের থলে শুদ্ধ সেই বুড়ো পাণ্ডা নিশ্চয় এই পথে গিয়াছিলেন। তখন তিনি আক্ষেপ করিয়াছিলেন কিনা, তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ক্লেশ তাঁহার খুবই হইয়াছিল, একথা বলিতে পারি।

পুরীর সমুদ্র তীরে নরিয়ারা।

আমাদের বাড়ী হইতে খানিক পশ্চিমে গেলেই নরিয়া দিগের গ্রাম। তাহারা সারি সারি ঘর বাঁধিয়া বাস করে, পাশাপাশি দু খানি ঘরের মাঝখানে কিছু মাত্র ফাঁক রাখে না। দরজা জানালার ধার অতি অল্পই ধারিয়া থাকে। হাওয়াত ঘরের ভিতর খেলেই না, জিজ্ঞাসা করিলে একজন বলিল "অতটুকু ঘরে আবার কত হাওয়া খেলিবে?" ঘরে, উঠানে, বাগানে, আঁস্তাকুড়ে ঘণ্ট পাকাইয়া তাহার ভিতরে উহারা বাস করে।

ইহারা এক রকম হিন্দু। ইহাদের দেব দেবী আছে, পুরুত আছে, মন্দির আছে। মন্দির বলিতে একটা কিছু কাণ্ড কারখানা মনে করিয়া বসিও না। সকলের চাইতে বড় মন্দিরটি ছাড়া আর কোনটির ভিতরে মানুষ ঢুকিবার জায়গা নাই। অধিকাংশ মন্দিরই বাক্স প্যাঁটরার মতন ছোট ছোট চালা ঘর মাত্র; উহার ভিতরে লাল, কাল, হলদে রঙের ছোট ছোট দেবতারা বড় বড় চোখ মেলিয়া যেন আশ্চর্য্য হইয়া বসিয়া

থাকে। একটি দেবতার আবার ঘর পছন্দ হয় না, সে হাঁড়ির ভিতরে থাকিতে ভালবাসে। মাঝে মাঝে পুরুত আসিয়া ইহাদের পূজা করিয়া যায়। নরিয়ারা ইহাদিগকে খুব মান্য করে, আর ইহাদের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা বলে। দুঃখের বিষয়, আমি দেবতাগুলির নাম ভুলিয়া গিয়াছি। এক জন আছে, তাহাকে হাতী ঘোড়া দিয়া পূজা করিতে হয়। উহার মন্দিরের পাশে বিস্তর হাতী ঘোড়া পড়িয়া আছে, ছোট ছোট মাটীর জিনিষ। এক সময়ে ঠিক এই রকম হাতী ঘোড়া আমাদের কুমারেরা গড়িত। ছেলে বেলায় আমরা তাহা দিয়া খেলা করিয়াছি। কিন্তু আজ কালকার খোকাদের হয়ত তাহা পছন্দই হইবে না। নরিয়াদের দেবতা ঐ হাতী ঘোড়া পাইয়াই যারপরনাই খুসী হয়। জানোয়ারগুলির অধিকাংশেরই হাত পা ভাঙ্গা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাঙ্গা হাতী ঘোড়া কেন দিয়াছ?" নরিয়া বলিল, "আমরা কেন ভাঙ্গা

নরিয়াদের মন্দির।

দিব? ঠাকুর উহাতে চড়িয়া চড়িয়া হাত পা ভাঙ্গিয়াছে।" তখন শুনিলাম, যে রোজ নাকি রাত দুপুরের সময় ঐ দেবতা বেড়াইতে বাহির হয়। এ সকল হাতী ঘোড়া তখন আর ওরূপ ছোট ছোট থাকে না, উহারা সত্য সত্যই বড় বড় হাতী ঘোড়া হইয়া যায়, আর ঠাকুর তাহাদের পিঠে চড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া আইসে।

এ কথা শুনিয়া এক জন বলিল, "আমি ত এই খানেই থাকি; কৈ? আমি ত একদিনও তোমাদের ঠাকুরকে ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইতে দেখি নাই!" নরিয়া বলিল, "দেখিলে কি না তুমি আবার বলিতে আসিতে।" অর্থাৎ উহাদের বিশ্বাস, যে সে সময়ে কেহ ঠাকুরের সামনে পড়িলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

রামা বাজারে মাছ কিনিয়াছে, সকলেই তাহার দাম জিজ্ঞাসা করে, তাহাতে রামার রাগ হইল। তখন রামা মাছ মাটিতে রাখিয়া রাস্তায় পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল, আর হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল। বাজারের সমস্ত লোক কাজকর্ম্ম ফেলিয়া রামার কাছে আসিয়া উপস্থিত। সকলেই বলে, "কি হইয়াছে?" "কি হইয়াছে?" রামা যখন বুঝিল, যে আর বেশীঅবশিষ্ট নাই, প্রায় সকলেই আসিয়াছে, তখন সে আস্তে আস্তে উঠিয়া গা ঝাড়িল, আর মাছটি উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল, "ওগো, আর কিছু নয়, আমার এই মাছটা স্যাড়ে সাত আনা হয়েছে, তোমরা সবাই শুনে রাখ! সাড়ে সাত আনা!! সাড়ে সাত আন!!!"

BENGAL LIBRARY
JAN 18. 1917
WRITERS BUILDINGS

নূতন ধাঁধা।

এক খোঁটে দুই ভাই একই ঠাঁই বন্ধ
বিশ্রাম নাহি জানে এ কেমন ধন্ধ!
বড় ভাই তড়বড় চট্‌পট্‌ চলে সে
ছোট ভাই ঢিমা তালে চলে অতি আলসে।
কথা চলে রাত দিন অদ্ভুত কারবার,
ফিরে ফিরে দেখা হয় ছেড়ে যায় বার বার—

১। কভু থাকি ঘাড়ে পিঠে কভু থাকি পাতা
সকালেতে কত লোকে খায় মোর মাথা।
মুড়োকাটা ধড় পাবে বাজারের দরে
গণ্ডা পুরাতে পার ল্যাজা মুড়া ধ'রে॥

অসুরের দেশ।

শ্মশানের মত দেশে—লোক নাই জন নাই· আছে কেবল প্রাচীন সহরের কঙ্কাল আর রাত্রের অন্ধকারে সিংহের হুঙ্কার।

চতুর্থ বর্ষ　　মাঘ, ১৩২৩　　দশম সংখ্যা

কাজের লোক।

১ম। বাঃ—আমার নাম "বাঃ" !
ব'সে থাকি তোফা তুলে পায়ের উপর পা !
লেখাপড়ার ধার ধারিনে, বছর ভরে ছুটী,
হেসে খেলে আরাম ক'রে দুশো মজা লুটি।
কারে কবে কেয়ার করি, কিসের করি ডর ?
কাজের নামে কম্প দিয়ে গায়ে আসে জ্বর।
গাধার মতন খাটিস্ তোরা মুখটি ক'রে চূণ—
আহাম্মুকি কাণ্ড দেখে হেসেই আমি খুন।

সকলে। আস্ত একটি গাধা তুমি স্পষ্ট গেল দেখা,
হাস্‌ছ যত, কান্না তত কপালেতে লেখা।

২য়। 'যদি' ব'লে ডাকে আমায় নামটি আমার 'যদি'—
আশায় আশায় ব'সে থাকি হেলান দিয়ে গদি।
সব কাজেতে থাক্‌ত যদি খেলার মত মজা—
লেখা পড়া হ'ত যদি জলের মত সোজা—

স্যাণ্ডো সমান ষণ্ডা হ'তাম যদি গায়ের জোরে,
প্রশংসাতে আকাশ পাতাল যদি যেত ভ'রে—
উঠে প'ড়ে লেগে যেতাম বাজে তর্ক ফেলে।
কর্‌তে পারি সবি—যদি সহজ উপায় মেলে।
সকলে। হাতের কাছে সুযোগ, তবু 'যদি'র আশায় বসে—
নিজের মাথা খাচ্ছ বাপু নিজের বুদ্ধি দোষে।

৩য়। আমার নাম 'বটে'! আমি সদাই আছি চ'টে—
কট্‌মটিয়ে তাকাই যখন, সবাই পালায় ছুটে।
চস্‌মা প'রে বিচার ক'রে, চিরে দেখাই চুল—
উঠ্‌তে বস্‌তে ক'চ্ছে সবাই হাজার গণ্ডা ভুল।
আমার চোখে ধুলো দেবে সাধ্যি আছে কার?
ধমক শুনে ভুতের বাবা হ'চ্ছে পগার পার!
হাস্‌ছ? বটে! ভাবছ বুঝি মস্ত তুমি লোক.
একটি আমার ভেংচি খেলে উল্টে যাবে চোখ।
সকলে। দিচ্ছ গালি লোকের তাতে কিবা এল গেল?
আকাশেতে থুতু ছুঁড়ে—নিজের গায়েই ফেল।

৪র্থ। আমার নাম 'কিন্তু,' আমায় 'কিন্তু' ব'লে ডাকে,
সকল কাজে একটা কিছু গলদ লেগে থাকে।
দশটা কাজে লাগি কিন্তু আটটা করি মাটি,
ষোল আনা কথায় কিন্তু সিকি মাত্র খাঁটি।
লম্ফ ঝম্ফ বহুৎ কিন্তু কাজের নাইকো ছিরি—
ফোঁস্ ক'রে যাই তেড়ে—আবার ল্যাজ গুটিয়ে ফিরি।
পাঁচটা জিনিষ গড়্‌তে গেলে, দশটা ভেঙে চুর—
বল্ দেখি ভাই কেমন আমি সাবাস বাহাদুর!
সকলে। উচিত তোমায় বেঁধে রাখা নাকে দিয়ে দড়ি,
বেগারখাটা পণ্ডকাজের মূল্য কাণাকড়ি।

৫ম। আমার নাম 'তবু,' তোমরা কেউ কি আমায় চেনো?
দেখ্‌তে ছোট তবু আমার সাহস আছে জেনো।
এতটুকু মানুষ তবু দ্বিধা নাইকো মনে,
যে কাজেতেই লাগি আমি খাটি প্রাণপণে।
এম্নি আমার জেদ্, যখন অঙ্ক নিয়ে বসি,
একুশ বারে না হয় যদি, বাইশ বারে কষি।
হাজার আসুক বাধা তবু উৎসাহ না কমে,
হাজার লোকে চোখ রাঙালে তবু না যাই দ'মে।

সকলে। নিষ্কর্ম্মারা গেল কোথা, পালাল কোন দেশে?
কাজের মানুষ কারে বলে দেখুক এখন এসে।
হেসে খেলে, সয়ে বসে কত সময় যায়,
সময়টা যে কাজে লাগায়, চালাক বলে তায়।

নিরেট গুরুর কাহিনী।

বামুনের ভবিষ্যৎবাণী।

মঠে ফিরিয়া আসিয়া গুরুর অত্যন্ত মন খারাপ হইয়া গেল। তাঁহার পাওনা ঘোড়াটার অনেক দোষ, তাহা হইলেও সেটাকে যে কিনিতে হয় নাই, ইহাতেই তিনি খুব খুসী ছিলেন। কিন্তু যখন এই ঘোড়ার জন্য তাঁহাকে কেবলই টাকা খরচ করিতে হইতে লাগিল আর নানারকম বিপদ ঘটিতে লাগিল, তখন তাঁহার মনের দুঃখ উথলিয়া উঠিল। তিনি সারাদিনরাত ধরিয়া ঐ কথাই ভাবিতে লাগিলেন। শেষে একদিন নিজের সব শিষ্যদের ডাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বৎসগণ, আমি দেখছি যে পৃথিবীর সব সুখই মিথ্যা। দুঃখ ছাড়া সুখ, মন্দ ছাড়া ভাল এখানে পাওয়া যায় না। যখন বিনা পয়সায় একটা ঘোড়া পেয়েছিলাম তখন আমাদের কত আনন্দই হয়েছিল! কিন্তু হায় হায়! দেখলে ত তার পরদিন থেকেই আমাদের কত দুর্গতিই না হল। এক ফোঁটা মধুর জন্য আমাদের কতখানি ঝালই খেতে হল। পৃথিবীর গতিকই এই। এককনা চাল যদি চাও তা হলে

ও সেটাকে তুঁষের ভেতর থেকে বের করতে হবে, আর যে কোনও ফলই খাওনা, হয় তার ছাল ছাড়াতে হবে নয় তার একটা আঁঠী থাকবে। এ সবই সত্যি বটে, তা হলেও আমি একদিনে এত ভোগ ভুগেছি যে মানুষে তা সইতে পারে না। ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানটা মোটেই আমার পক্ষে ঠিক নয়। আমার কপালে ওটা লেখা নেই, কাজেই বিধাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাহস করে কাজ করতে নেই। তা হলে ঘোড়াটা যার কাছে পাওয়া গেছে তাকেই ফিরিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্।" গুরুর কথা শেষ হইতে না হইতে পাঁচ শিষ্য একেবারে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, "আরে মশায়, আপনি বলেন কি? এও কি একটা কথা হল? ঘোড়াটাত আর আপনার কেনা ঘোড়া নয়, আর ওটাকে আমরা খুঁজে পেতেও আনিনি। আমাদের ঘোড়ার দরকার ছিল দেখে ভগবান ওটাকে পাঠিয়ে দিলেন যে। এখন ভগবানের দেওয়া ঘোড়া ফিরিয়ে দিলে ভয়ানক পাপ হবে। তা ছাড়া এখন আর ভয় কি? সেই দৈবজ্ঞ ত ওর সব দোষ দূর করে দিয়েছে?"

শিষ্যদের এত লম্বা বক্তৃতা শুনিয়া গুরুর একটু সাহস হইল, তিনি তখন বলিলেন, "আচ্ছা তোমরা যা বলছ তাই করা যাক্। কিন্তু একবার ঘোড়াটাকে রাত্রে ছেড়ে দিয়ে যে রকম ভুগেছি, আর ওকে ছাড়া হচ্ছে না। এবার থেকে ওটাকে রাত্রে বেঁধে রাখতে হবে, কিন্তু রাখ্‌ব কোথায় সেইত হচ্ছে ভাবনা।" হাঁদা বলিল, "তার জন্য আবার ভাবনা কি? আমি এখুনি গিয়ে গাছের ডাল কেটে আনছি, দেখবে এখন কেমন তোফা আস্তাবল বানিয়ে দেব।"

এই বলিয়াই হাঁদা বাহির হইয়া পড়িল। কিছুদূরে গিয়া একটা প্রকাণ্ড বটগাছ দেখিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ সেই গাছে চড়িয়া বসিল এবং যে ডালটাতে বসিয়াছিল সেইটারই গোড়া দা দিয়া কাটিতে আরম্ভ করিল। একজন বামুন তখন সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, মাথার উপর ধুপধাপ্ শব্দ শুনিয়া উপরে চাহিয়া হাঁদার কীর্ত্তি দেখিতে পাইল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "ওহে, করছ কি? নিজেও যে ডালের সঙ্গে গড়িয়ে পড়বে"। হাঁদা অত্যন্ত চটিয়া গিয়া বলিল, "কে হে তুমি? যত সব অমঙ্গলের কথা বলতে এলে?" বলিয়া একখানা ছুরী তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। ব্রাহ্মণ ভাবিল, "কোথাকার গাধা? মরুক্ গে আমি কেন মার খাই"। সে তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িল।

এ দিকে হাঁদা সেই ডালটাতে আর কয়েক কোপ বসাইতেই, ডালটা ভাঙ্গিয়া গেল এবং সেও ডালপালা সবশুদ্ধ দড়াম্ করিয়া নীচে গড়াইয়া পড়িল। প্রথমে সে খুব

হাঁউ মাঁউ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, তারপর একটু ঠাণ্ডা হইয়া ভাবিল, "নিশ্চয়ই সেই বামুন একজন দৈবজ্ঞ, তিনি যা বল্লেন ঠিক্ তাই ত হল!" এই ভাবিয়া সে উঠিয়া

পড়িয়া সেই ব্রাহ্মণের পিছনে ছুটিয়া চলিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ভাবিল বোকাটা না জানি আবার কি করে। হাঁদা তাহার কাছে আসিয়া খুব ভক্তিভরে তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মশায়, আপনি দেখছি একজন মস্ত পণ্ডিত, আপনি যা বল্লেন ঠিক তাই হল। তা আপনি আমার আর একটা কথা দয়া করে বলে দিন্। আমি গুরু নিরেটের একজন শিষ্য, আমি তাঁকে বড্ড ভালবাসি। তিনি বুড় হয়েছেন, কখন মারা পড়েন, এই আমাদের ভয়। এখন আমায় একটু বলে দিন্ যে তিনি কখন মরবেন, আর মরবার আগে কি কি লক্ষণই বা দেখা যাবে"।

ব্রাহ্মণ হাঁদার হাত ছাড়াইয়া পালাইবার জন্য অনেক ওজর আপত্তি করিতে লাগিল, কিন্তু ছাড়িয়া দিবার পাত্রই হাঁদা নয়। অবশেষে ব্রাহ্মণ বাধ্য হইয়া বলিল, "আচ্ছা বলছি, 'চরণম্ শীতম্ জীবন নাশম্'"। হাঁদা হাত জোড় করিয়া বলিল, "ঠাকুর মশায়, এর মানেটা বলে দিন্"। ব্রাহ্মণ বলিল, "অর্থাৎ কিনা, যে দিনে তোমাদের গুরুর পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, সেই দিনই তিনি মারা যাবেন", এই বলিয়াই সে দৌড় দিল।

হাঁদা তখন খুব খুসী হইয়া ডালটাকে টানিতে টানিতে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, এবং সকলকে সব কথা খুলিয়া বলিল। গুরু অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "সে বামুন যে একজন মস্ত পণ্ডিত তাতে কোনই ভুল নেই, কারণ তিনি তোমার সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তোমারও ত ঠিক তাই হল। আমার সম্বন্ধেও যা বলেছেন, তা নিশ্চয়ই ঘট্‌বে। তা এখন থেকে খুব সাবধান হয়ে থাকতে হবে, পা টা আর ধোওয়া হবেনা, তারপর ভগবানের যা ইচ্ছে।"

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

(পদ্মপুরাণ)

(২)

গতবারের সন্দেশে মহাদেব ও হনুমান আখ্যানে বলা হইয়াছে—হনুমান সঞ্জীবনী ঔষধ আনিয়া সকলকে জীবিত করিল।

শত্রুঘ্ন, পুষ্কল প্রভৃতি বীরগণ যেন যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, সঞ্জীবনী ঔষধ ছোঁয়াইবা মাত্র মার মার শব্দে সকলে জাগিয়া উঠিলেন। পুনরায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এবারও বীরমণি শত্রুঘ্নের সহিত যুদ্ধে হারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ভক্তের দুর্গতি দেখিয়া মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া শত্রুঘ্নের সহিত ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সে আক্রমনের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুঘ্ন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া হনুমানের উপদেশ মত রামচন্দ্রকে ডাকিতে লাগিলেন—"হে প্রভু! মহাদেব আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার শক্তি লোপ পাইয়াছে—আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া আমাকে রক্ষা

করুন।” শত্রুঘ্ন মনে মনে স্মরণ করিবা মাত্র রাম যজ্ঞদীক্ষিত মূর্ত্তিতেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দেখা দিলেন।

স্বয়ং রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া মহাদেব সসম্মানে অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। ভক্তকে রক্ষা করাই দেবগণের কর্ত্তব্য কার্য্য, সুতরাং মহাদেব বীরমণিকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া রাম কেন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন? তিনি বরং সন্তুষ্ট হইয়াই বলিলেন—“বীরমণিকে রক্ষা করিতে গিয়া আপনি যে আমার সহিত শত্রুতা করিয়াছেন তাহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। যে আপনার ভক্ত সে আমারও ভক্ত”—এই বলিয়া রাম হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মহাদেবও তখন বীরমণিকে সুস্থ করিয়া বলিলেন—“তুমি রামের যজ্ঞাশ্ব ফিরাইয়া দিয়া শত্রুঘ্নের শরণ লও।”

বিজয়ী যজ্ঞাশ্ব মুক্তি পাইয়া পুনরায় দিগ্বিজয়ে চলিল। বীরমণিও সৈন্য-সামন্ত লইয়া শত্রুঘ্নের সহিত অশ্ব রক্ষার্থ চলিলেন।

অনেক রাজার রাজ্য অতিক্রম করিয়া অশ্ব হেমকূট পর্ব্বতের নিকটে একটা বাগানের ভিতর গিয়া উপস্থিত। বাগানের মধ্য দিয়া খানিক দূর অগ্রসর হইলে পর হঠাৎ অশ্বের গতি রুদ্ধ হইল। তাহার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, শত চেষ্টা করিয়াও আর অগ্রসর হইতে পারিল না। পুষ্কল আসিয়া কত টানাটানি করিলেন, হনুমান লাঙ্গুল দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কত আকর্ষণ করিল, কিন্তু কিছুতেই অশ্ব নড়িল না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া শত্রুঘ্ন তখন মন্ত্রী সুমতিকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুমতির পরামর্শে তখন সকলে মিলিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর শৌনক মুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া শৌনক বলিলেন—“কাবেরী নদীর তীরে একটি বনের মধ্যে বাড়ব নামক এক ব্যক্তি অতি কঠোর তপস্যা করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া মেরু পর্ব্বতে বাস করেন। ক্রমে তিনি অভিমানে মত্ত হইয়া তথাকার মুনিদিগের সহিত বিবাদ আরম্ভ করায় মুনিরাও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া “তুই রাক্ষস হ” এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন। তখন তিনি দয়ালু মুনিদিগের পায়ে ধরিয়া অনেক স্তুতি মিনতি করিলে পর তাঁহারা বলিলেন—“যখন রামের যজ্ঞাশ্বকে তুমি স্তম্ভিত করিবে সেই সময়ে রামের গুণ-কীর্ত্তন শুনিলে পর তোমার শাপ দূর হইবে।” সেই বাড়ব রাক্ষস হইয়া রামের অশ্ব অচল করিয়াছেন—এখন তাঁহার নিকট রামের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া আমাকে মুক্তি কর।”

মুনিবর শৌনকের উপদেশে শত্রুঘ্ন সকলকে লইয়া অশ্বের নিকট ফিরিয়া গেলেন। হনূমান শ্রীরামের গুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিল—"হে বাড়ব! রামের গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণের পুণ্যফলে আপনি রাক্ষসদেহ হইতে মুক্ত হউন।" এই কথা বলিবা মাত্র বাড়ব রাক্ষসদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন—যজ্ঞাশ্বও পুনরায় সুস্থ সবল হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমাগত সাত মাস কাল যজ্ঞীয় অশ্ব কত শত শত রাজার দেশ ভ্রমণ করিল। রামের বলবিক্রম স্মরণ করিয়া কেহই তাহাকে ধরিতে সাহস পাইল না। ক্রমে সেই অশ্ব কুণ্ডলনগরে সুরথ রাজার রাজ্যে গিয়া উপস্থিত। সুরথ রাজা মহা পরাক্রমশালী যোদ্ধা, রামের পরম ভক্ত। তিনি মহা আনন্দিত হইয়া হুকুম দিলেন—"অশ্বকে বাঁধিয়া রাখ। আমি বহুদিন হইতে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতেছি, তিনি যখন স্বয়ং আসিয়া আমায় দেখা দিবেন তখনি যজ্ঞীয় অশ্ব ফিরাইয়া দিব।" রাজাজ্ঞায় সৈন্যগণ অশ্বকে বাঁধিয়া রাখিল।

এদিকে শত্রুঘ্ন অনুচরগণের মুখে এই সংবাদ পাইয়া চিন্তিত হইলেন।

তখন মন্ত্রী সুমতির কথায় শত্রুঘ্ন অঙ্গদকে দূত করিয়া পাঠাইলেন। অঙ্গদ সুরথ রাজার সভায় গিয়া বলিল—"মহারাজ! আপনার লোকেরা রামচন্দ্রের যজ্ঞাশ্ব বাঁধিয়া রাখিয়াছে; আপনি উহা ফিরাইয়া দিয়া শত্রুঘ্নের শরণ লউন।" রাজা সুরথ বলিলেন—"দূত! তোমার প্রভু শত্রুঘ্নকে গিয়া বল যে আমি জানিয়া শুনিয়াই অশ্ব ধরিয়াছি; শত্রুঘ্নের ভয়ে আমি কখনই তাহা ফিরাইয়া দিব না। রামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া যখন আমাকে দর্শন দিবেন, তখন আমি স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত তাঁহার শরণ লইব।"

তখন উভয় দলে ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রথমেই পুষ্কলের সহিত সুরথপুত্র চম্পকের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যোদ্ধা কেহই কম নয়, আশ্চর্য্য কৌশলে উভয়ে উভয়ের অস্ত্র সকল বিফল করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ ভয়ানক যুদ্ধের পর রাজকুমার চম্পক পুষ্কলকে রামাস্ত্র মারিলেন। পুষ্কলও তাহা কাটিবার জন্য অনেক অস্ত্র ছাড়িলেন বটে কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সেই অস্ত্র তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

তখন শত্রুঘ্ন হনূমানকে বলিলেন,—"শীঘ্র পুষ্কলকে উদ্ধার কর নতুবা এখনি চম্পক তাহাকে রাজপুরীতে লইয়া যাইবে।" তৎক্ষণাৎ হনূমান চম্পকের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। এইরূপে বাধা পাইয়া চম্পক হনূমানকে একসঙ্গে একহাজার বাণ মারিলেন,

কিন্তু হনুমান তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাণ্ড শালগাছ লইয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল। চম্পকের বাণে শালগাছ যখন কাটিয়া গেল তখন হনুমান চম্পকের উপর প্রকাণ্ড একটা হাতী ছুঁড়িয়া মারিল। কিন্তু তিনি হাতীটাও কাটিয়া ফেলিলেন। তখন হনুমান চম্পকের হাত ধরিয়া এক লাফে তাঁহাকে লইয়া শূন্যে উঠিল এবং লাথি মারিয়া আবার তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। হনুমানের প্রচণ্ড লাথি খাইয়াও রামভক্ত চম্পক আবার উঠিয়া তাহার লেজ ধরিয়া বিষম টানাটানি করিতে লাগিলেন। তখন হনুমান তাঁহার দুটি পা ধরিয়া বন্ বন্ শব্দে এমনি ঘুরাইতে লাগিল যে, চম্পক অজ্ঞান হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এই অবসরে হনুমান পুষ্কলের বাঁধন খুলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিল।

রাজা সুরথ তখন মহা ক্রোধে হনুমানকে আক্রমণ করিলেন। দুইজনই রামের পরম ভক্ত এবং মহা যোদ্ধা, সকলে উৎসুক হইয়া উভয়ের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

রাজা সুরথ হনুমানের বুকে দারুণ এক অস্ত্র মারিলেন, হনুমান তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বিকট চীৎকার করিতে করিতে দুই হাতে তাঁহার ধনু ধরিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। চক্ষের নিমেষে সুরথ অন্য ধনু লইলেন তাহাও হনুমান ভাঙ্গিয়া দিল। এইরূপে রাজা ক্রমান্বয়ে আশীটি ধনু লইলেন, হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে সমস্ত ধনুই চুরমার করিয়া দিল। রাজা সুরথ তখন মহা ক্রোধে ভীষণ এক শক্তি মারিয়া হনুমানকে ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে জ্ঞানলাভ করিয়া হনুমান সুরথের রথখানাশুদ্ধ এক লাফে শূন্যে উঠিল এবং রথটিকে এমন বেগে মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিল যে সারথীশুদ্ধ রথ একেবারে চুরমার। ইহার পর রাজা যে রথে চড়িতে যান হনুমান তাহাই ভাঙ্গিয়া ফেলে; এইরূপে রাজার পঞ্চাশখানা রথ ভাঙ্গিল। এই অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া রাজা সুরথ বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর পাশুপত অস্ত্র ছাড়িলেন। অস্ত্রের তেজ দেখিয়া ভয়ে সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু হনুমান মনে মনে রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া পাশুপত অস্ত্রও ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সুরথ ব্রহ্মাস্ত্র মারিলেন। হনুমান হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মাস্ত্র লুফিয়া লইল। তখন বেগতিক দেখিয়া রাজা সুরথ মনে মনে রামকে স্মরণ করিয়া ধনুকে রামাস্ত্র জুড়িলেন এবং সেই অস্ত্রে হনুমানকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। হনুমান বলিল— "অন্য কোনও অস্ত্র মারিলে দেখিতাম; কিন্তু কি করিব—আমার প্রভুর অস্ত্রেই বাঁধা পড়িলাম।"

হনুমান বাঁধা পড়িল দেখিয়া পুষ্কল রাগিয়া সুরথকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না—রাজা নারাচ অস্ত্র মারিয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। তখন শত্রুঘ্ন আসিয়া সুরথ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুরথ চক্ষের নিমেষে হাজার হাজার, কোটি কোটি বাণ মারিয়া শত্রুঘ্নকে অস্থির করিয়া ফেলিলেন, বাণে বাণে চারিদিক একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল। শত্রুঘ্ন নিরুপায় হইয়া ধনুকে যোগিনীপ্রদত্ত অদ্ভুত মোহনাস্ত্র জুড়িলেন। মোহনাস্ত্র মারিলে আর রক্ষা নাই, যুদ্ধক্ষেত্রে সমুদায় বীরগণেরই মোহ হইবে। সুরথ কিন্তু একটুও চিন্তিত হইলেন না। তিনি নির্ভয়ে শত্রুঘ্নকে বলিলেন—"বীরবর! আমি রামনাম স্মরণ করিয়া তোমার মোহনাস্ত্রকেও অগ্রাহ্য করি।" মোহনাস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া শত্রুঘ্ন যার পর নাই আশ্চর্য্য ও ব্যস্ত হইয়া যে বাণ দ্বারা তিনি লবনাসুরকে বধ করিয়াছিলেন সেই ভীষণ আগুনের মত বাণ ধনুকে সন্ধান করিলেন।

সুরথ নির্ভয়চিত্তে বলিলেন—"এই বাণ শুধু দুষ্টলোকদিগকে বধ করে, রামভক্তের সম্মুখেও আসিতে পারে না।" বাস্তবিক সে বাণ রাজার বুকে বিন্ধিয়া কেবল ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে অজ্ঞান করিল। পর মুহূর্ত্তেই চেতনা পাইয়া তিনি ধনুকে মহা অদ্ভুত এক বাণ যুড়িলেন। বাণের মুখ দিয়া ধক্ ধক্ করিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল—শত্রুঘ্ন পথের মধ্যেই সে বাণ কাটিয়া ফেলিলেন বটে, কিন্তু বাণের অগ্রভাগ ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বুকে বিন্ধিল। তিনি রথের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন বানররাজ সুগ্রীব সিংহনাদ করিতে করিতে সুরথকে আক্রমণ করিলেন। সুরথ রাজা কত ভয়ানক ভয়ানক বাণ সকল মারিলেন কিন্তু সুগ্রীব হাসিতে হাসিতে অনায়াসে সে সমস্ত লুফিয়া লইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন আবার রামাস্ত্র মারিয়া সুগ্রীবকেও তিনি বাঁধিলেন। তখন আর কথা কি! হনুমান, পুষ্কল শত্রুঘ্ন আর সুগ্রীবকে লইয়া তিনি পুরীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

রাজপুরীতে গিয়া হনুমানকে বলিলেন—"বাছা হনুমান! এখন প্রভু রামচন্দ্রকে স্মরণ কর, তিনি আসিয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করুন।" হনুমান তখন যোড়হস্তে স্তুতি মিনতি করিয়া রামকে ডাকিতে লাগিল। তখন রামচন্দ্র স্বয়ং সুরথ রাজার পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম আসিবা মাত্র পুষ্কল ও শত্রুঘ্নের জ্ঞান হইল, হনুমান ও সুগ্রীব বন্ধনমুক্ত হইল। রাজা সুরথ স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত শ্রীরামের চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিলেন—"প্রভু! আমি যে আপনার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি

সে জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।” রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“তুমি ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কাজই করিয়াছ, আমিও তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি।”

ইহার পর রাজা সুরথ অশ্ব ফিরাইয়া দিলেন। অশ্ব পুনরায় দিগ্বিজয়ে চলিল। সুরথও চম্পককে সিংহাসনে বসাইয়া শত্রুঘ্নের সঙ্গে অশ্ব রক্ষার্থে যাত্রা করিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

ভাঙা তারা।

(মাওরি দেশের গল্প)

মাতারিকি আকাশের পরী। আকাশের পরী যারা, তাদের একটি করে তারা থাকে। মাতারিকি তার তারাটিকে রোজ সকালে শিশির দিয়ে ধুয়ে মেজে এমনি চক্‌চকে ক'রে সাজিয়ে রাখ্‌ত যে, রাত্রিবেলা সবার আগে তার উপরেই লোকের চোখ পড়্‌ত—আর সবাই বল্‌ত—“কি সুন্দর!” তাই শুনে শুনে আর সব আকাশ পরীদের ভারি হিংসা হ'ত।

তানে হচ্ছেন গাছের দেবতা। তিনি গাছে গাছে রস যোগাতেন, ডালে ডালে ফুল ফোটাতেন, আর তাদের সবুজ তাজা পাতার দিকে অবাক হ'য়ে ভাবতেন। “এ জিনিষ দেখ্‌লে পরে আর কিছুর পানে লোকে ফিরেও চাইবে না।” কিন্তু লোকেরা গাছের উপর দিয়ে বার বার কেবল মাতারিকির তারা দেখ্‌ত, আর কেবল তার কথাই বল্‌ত। তানের বড় রাগ হ'ল। সে বল্ল, “আচ্ছা, তারার আলো আর কত দিন? দুদিন বাদেই ঝাপ্‌সা হয়ে আসবে।” কিন্তু যত দিন যায়, তারা ততই উজ্জ্বল আর ততই সুন্দর হয়, আর সবাই তার দিকে ততই বেশী করে তাকায়। একদিন অন্ধকার রাত্রে যখন সবাই ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে, তখন তানে চুপি চুপি দুজন আকাশ পরীর কানে কানে বল্‌ল “এস ভাই, আমরা সবাই মিলে মাতারিকিকে মেরে তারাটাকে পেড়ে আনি।” পরীরা বল্‌ল “চুপ, চুপ, মাতারিকি জেগে আছেন। পূর্ণিমার জোছনা রাতে আলোয় শুয়ে মাতারিকির চোখ যখন আপনা হ'তে ঢুলে আসবে সেই সময়ে আবার এস।”

এসব কথা কেউ শুনল না, শুনল খালি জলের রাজার ছোট্ট একটি মেয়ে। রাজার মেয়ে রাত্রি হলেই সেই তারাটির ছায়া নিয়ে খেলতে খেলতে জলের নীচে ঘুমিয়ে পড়ত আর মাতারিকির স্বপ্ন দেখত। দুষ্ট পরীর কথা শুনে তার দু'চোখ ভ'রে জল আসল।

এমন সময় দখিন হাওয়া আপন মনে গুণগুনিয়ে জলের ধারে এসে পড়ল। রাজার মেয়ে আস্তে আস্তে ডাকতে লাগল "দখিন হাওয়া শুনেছ? ওরা মাতারিকিকে মারতে চায়!" শুনে দখিন হাওয়া 'হায়' 'হায়' ক'রে কেঁদে উঠল। রাজার মেয়ে বল্‌ল, "চুপ চুপ, এখন উপায় কি বলত?" তখন তারা দুজন পরামর্শ করল যে, মাতারিকিকে জানাতে হবে—সে যেন পূর্ণিমার রেতে জেগে থাকে।

ভোর না হ'তে দখিন হাওয়া রাজার মেয়ের ঘুম ভাঙিয়ে বল্‌ল "এখন যেতে হবে।" সূর্য্য তখন স্নানটি সেরে সিঁদুর মেখে সোণার সাজে পূবের দিকে দেখা দিচ্ছেন। রাজার মেয়ে তার কাছে আবদার করল "আমি আকাশের দেশে বেড়াতে যাব!" সূর্য্য তার একখানি সোণালি কিরণ ছড়িয়ে দিলেন। সেই কিরণ বেয়ে বেয়ে রাজার মেয়ে উঠ্‌তে লাগলেন। সকাল বেলার কুয়াসা দিয়ে দখিন হাওয়া তাঁকে ঘিরে ঘিরে চারদিকেতে ঢেকে রাখল। এমনি করে রাজার মেয়ে মাতারিকির বাড়ীতে গিয়ে সব খবর বলে আসল। মাতারিকি কি করবে? সে বল্‌ল "আমি আর কোথায় যাব? পূর্ণিমার রাতে এইখানেই পাহারা দিব—তার পরে যা হয় হবে।"

রাজার মেয়ে ঝাপ্‌সা মেঘের আড়াল দিয়ে বৃষ্টি বেয়ে নেমে আসলেন।

তারপর পূর্ণিমার রাতে তানে আর সেই দুষ্টু পরীরা ছুটে বেরুল, মাতারিকির তারা ধরতে। মাতারিকি দুহাত দিয়ে তারাটিকে আঁকড়ে ধ'রে প্রাণের ভয়ে ছুট্‌তে লাগল। ছুট্, ছুট্, ছুট্! আকাশের আলোর নীচে, ছায়াপথের ছায়ায় ছায়ায় নিঃশব্দে ছুটোছুটি আর লুকোচুরি। দখিন হাওয়া স্তব্ধ হ'য়ে দেখতে লাগল, রাজার মেয়ে রাত্রি জেগে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল। তারায় তারায় আকাশপরী, কিন্তু মাতারিকি যার কাছেই যায়, সেই তাকে দূর' দূর' ক'রে তাড়িয়ে দেয়।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে মাতারিকি হাঁপিয়ে পড়ল—আর সে ছুট্‌তে পারে না। তখন তার মনে হ'ল "জলের দেশে রাজার মেয়ে আমায় বড় ভাল বাসে—তার কাছে লুকিয়ে থাকি।" মাতারিকি ঝুপ্ করে জলে পড়েই ডুব, ডুব, ডুব—একেবারে জলের তলায় ঠাণ্ডা কালো ছায়ার নীচে লুকিয়ে রইল। রাজার মেয়ে আপনি তাকে শেওলা ঢেকে আড়াল করলেন।

সবাই তখন খুঁজে সারা—"কোথায় গেল, কোথায় গেল?" একজন পরী ব'লে উঠ্‌ল "ঐ ওখানে—জলের নীচে।" ভানে বল্লেন "বটে! মাতারিকিকে লুকিয়ে রাখছ

কে?" রাজার মেয়ের বুকের মধ্যে দুর দুর করে কেঁপে উঠ্‌ল—কিন্তু তিনি কোনকথা বল্‌লেন না। তখন ভানে বল্‌ল "আচ্ছা দাঁড়াও। আমি এর উপায় করছি।" তখন সে জলের ধারে নেমে এসে হাজার গাছের শিকড় মেলে শোঁ শোঁ করে জল টান্‌তে লাগ্‌ল।

তখন মাতারিকি জল ঝেড়ে উঠে আসল। জলের নীচে আরামে শুয়ে তার পরিশ্রম দূর হ'য়েছে, এখন তাকে ধরবে কে? আকাশময় ছুটে ছুটে কাহিল হ'য়ে সবাই বল্‌ছে "আর হলোনা।" ভানে তখন রেগে বল্‌ল "হতেই হবে।" এই ব'লে হঠাৎ সে পথের পাশের একটা মস্ত তারা কুড়িয়ে নিয়ে মাতারিকির হাতের দিকে ছুঁড়ে মারল।

ঝন্ ঝন্ ক'রে শব্দ হ'ল, মাতারিকি হায় হায় ক'রে কেঁদে উঠ্‌ল, তার এতদিনের সাধের তারা সাত টুকরো হ'য়ে ভেঙে পড়্‌ল। ভানে তখন দৌড়ে এসে সেগুলোকে দুহাতে ক'রে ছিটিয়ে দিল আর বল্‌ল, "এখন থেকে দেখুক সবাই—আমার গাছের কত বাহার!" দুষ্টু পরীরা হো হো করে হাস্‌তে লাগল।

এখনও যদি দখিন হাওয়ার দেশে যাও, দেখবে সেই ভাঙা তারার সাতটি টুকরো আকাশের একই জায়গায় ঝিক্‌মিক্ করে জ্বলছে। ঘুমের আগে রাজার মেয়ে এখনও তার ছায়ার সঙ্গে খেলা করে। আর জোছনা রাতে দখিন হাওয়ায় মাতারিকির দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়।

পেটুক রামু।

পেটুক রামু পেটুক ভারি দিন রাতই ভাবে,
পোলাও লুচি পায়েস কত, কত মিঠাই খাবে।
খাবার কথা ভেবে ভেবে ঘুমের ঘোরে রোজ,
একদিন সে দেখ্‌ছে যেন মামার বাড়ী ভোজ।

কত রকম খাবার পাতে ঠিকানা তার নাই,
কোন্‌টা সে যে ধরবে আগে ভাব্‌ছে রামু তাই।
অনেক ভেবে, মাছের মুড়ো যেমনি তোলা শেষে,
ভাজা মাছটা ফেল্‌ল হঠাৎ ফিক্‌ ক'রে হেসে।
তাই না দেখে, দইয়ের বাটী দুই পা তুলে যায়,
মিঠাই গুলো মুখের দিকে চগ্‌বগিয়ে চায়।
গা ঝাড়া দেয় মালপুয়া আর বরফি ছিল যত,
চলল লুচি, গড়গড়িয়ে, গাড়ীর চাকার মত।
দৌড়ে আসে জিবে গজা, দু হাত জিব নেড়ে,
থতমত রামুর পানে, সবাই এল তেড়ে।
ভয়ের চোটে, যেই না রামু উঠ্‌ল ধড়্‌মড়িয়ে,
দুড়ুম্‌ ক'রে পড়্‌ল নীচে, বিছ্‌না বালিস নিয়ে।*

পুরাতন চিঠি।

[৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত কয়েকখানা চিঠি হইতে উদ্ধৃত]

(১)

কাল সন্ধ্যার সময় পুরী থেকে ফিরে এসেছি। রা— বাবুরা তাঁদের নূতন বাড়ীতে এসেছেন। ম— এখন আর একটু বড় হয়েছে; কিন্তু তেমনি তোৎলা কথা কয়। লোক জন এলে খুব ভাব করে নেয়; বড় মানুষদের মতন তাদের বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা করে। "বাঅ আতেন" "ভেয়ে পুয়ে বাঅ আতে?" এই রকম সব কথা জিজ্ঞাসা করে। আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিল। বেহালা দেখেই সে ভারি ব্যস্ত হয়ে গেল; তখনই তাকে বাজিয়ে শুনাতে হবে। একটা বাজালাম শুনে বল্ল "খুব বাঅ, আয়েকটা।" সে নিজেও গান গাইল "হেদ্দি অবাল্‌ পাতিম্বাই, পাতিম্বাই।" "কে বাদাবে বাদনা।" সে দিন তাদের এক জায়গায় নিমন্ত্রণ ছিল, তাই তার সঙ্গে আর বেশী কথা বার্ত্তা হতে পারল না। আমার লোহার বাঁটের ছাতাটা

---

* শ্রীমতী সুখলতা রাও প্রণীত নূতন বই "পড়াশুনা" শীঘ্রই ছাপা হইবে। এই ছবি ও কবিতা তাহা হইতে লওয়া হইয়াছে।

তার খুব ভাল লেগেছে। সেটাকে সে একবার খুলে মাথায় দিল, আর বল্ল যে তার নিজের ছাতাটা বিশ্রী।

(২)

আজ সকালে *** ** আর আমি তারের পোলের উপর দিয়ে উস্ত্রীর ওপারে গিয়েছিলাম। যখন মাঝামাঝি গিয়েছি, তখন **কে ভয় দেখাবার জন্য *** পোলটাকে দোলাতে লাগ্‌ল, আর ** যার পর নাই ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

তারপর এপারে আসবার সময় আমি আর ** হেঁটে জল ভেঙ্গে এলাম, আর *** পোলের উপর দিয়ে এল। আমরা বল্‌লাম 'দেখি, কে আগে যেতে পারে।' আমরা যতক্ষণ জুতো মোজা খুলে প্রস্তুত হচ্ছিলাম, ততক্ষণ *** পোলের মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে রইল। সকলে প্রস্তুত হ'লে আমাদের রেস্ হ'ল। আমি ভেবেছিলান আমরা ঢের আগে যাব। কিন্তু *** দু পা ফাঁক করে, কোমর বাঁকিয়ে, দুহাত ছড়িয়ে, পোলের উপর দিয়ে এম্‌নি ছুট দিল যে আমরা জল টুকু মাত্র পার হবার অনেক আগেই সে গিয়ে ওপারে উপস্থিত হ'ল। তখন যদি পিছন থেকে তার চেহারা দেখতে! এই

এম্‌নি করে ছুটেছিল। আমরা যতক্ষণে এ পারে ফিরে এলাম ততক্ষণে সে ইচ্ছা কর্‌লে আবার গিয়ে ফিরে আসতে পারত। এখনও তার সে ছুটের কথা মনে করলে আমার হাসি পায়।

(৩)

"আগে খেতে বসলেই ইঁদুর আসত। মাঝে কল দিয়ে কয়েকটাকে ধরাতে কয় দিন আসেনি। এখন আবার একটা ছোট ইঁদুর আসতে আরম্ভ করেছে। এটা খুব ছেলেমানুষ, ভাল করে বুদ্ধি টুদ্ধি হয় নি। আমাকে শুঁক্‌তে এসে গোঁফ দিয়ে আমার পায়ে সুড়সুড়ি লাগিয়ে দেয়। প্লেটের কানার উপর দিয়ে উঁকি মেরে আমার ফল খাওয়া দেখে, তারপর সাহস পেয়ে প্লেটের উপরে উঠে বসে। আমি একটু নড়্‌লে চড়্‌লে ভয় পেয়ে ছুটে পালায়; একবার আমার পায়ের তলায় এসে লুকিয়েছিল। ফল টল কিন্তু সে পছন্দ করে না, শুঁকে দেখেই চলে যায়। দৈও খায় না। খায়

খালি ভাত আর একটু আধটু তরকারী। সেদিন তোমার ঠাকুরমা মোচাভাজা পাঠিয়েছিলেন, আমি দাঁতের ব্যথায় সেটা ভালকরে না খেতে পেরে চিবিয়ে ছিবড়ে ফেলেছিলাম। সেই ছিব্‌ড়েটা পেয়ে সে যার পর নাই খুসী হয়েছিল। সেটাকে নিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে মীটসেফের তলায় চলে গেল। আমি যখন একলা ঘরে থাকি, তখনই সে আসে। প্রয়াগের সাড়া পেলেই পালিয়ে যায়।”

(৪)

“আমি যে ঘরে বসে লিখছি, সে ঘরের চালে হনুমান এসেছে। ঘরটা ইঁটের, কিন্তু তার চাল খোলার। হনূরা সেখানে এসে সব খোলা উলটে দেয়, আর হুপ্‌ হাপ্‌ করে লাফিয়ে ভেঙ্গে দেয়। তাই সে ঘরের চালে মস্ত মস্ত ফুটো, তার ভিতর দিয়ে আকাশ দেখা যায়। হনূমান আস্‌লে ছেলেরা বাঁশ নিয়ে তাদের তাড়া করে, আর তারা ছুটে রীঠা গাছের দিকে পালিয়ে যায়। বড় বড় দুটো রীঠা গাছ আছে, তার সরু সরু ডাল। হনূরা সেই ডাল দিয়ে পথে হাঁটবার মতন তাড়াতাড়ি চলে যায়। আমরা যেমন করে পান খাই, তেমনি করে রীঠার কচি পাতা ছিঁড়ে খেতে থাকে, আর এক একবার চেয়ে দেখে ছেলের দল আছে কি না।

এখানে মর্কট বাঁদরও আছে। তাকে এখানকার লোকেরা “পাতি মাকড়” বলে। হনূমানেরা মর্কটকে বড় ভয় করে, আর তাদের দেখলে পালিয়ে যায়। মর্কট ছোট, হনুমান অনেক বড়, কিন্তু তবু হনূমানেরা মর্কটদের সঙ্গে পারে না।”

“আমরা যে নক্স্‌ ভমিকা ঔষধ খাই বাংলাতে তাকে কুচিলা বলে। ওড়িয়ারাও তাই বলে। কুচিলা খেতে ভয়ানক তেতো, আর ভয়ানক বিষ। কিন্তু হনূমানদের তাতে কিছু হয় না। তাদের দেখ্‌লাম দলে দলে কুচিলা গাছে বসে তার ফল খাচ্ছে। কুচিলার ফল দেখ্‌তে ছোট কমলা লেবুর মতন হল্‌দে গোল গোল। এক একটা গাছে অনেক হয়, আর পাকা ফল শুদ্ধ গাছ গুলিকে দেখ্‌তে বেশ সুন্দর দেখা যায়।”

পাগ্‌লা দাশু।

আমাদের স্কুলের যত ছাত্র তাহার মধ্যে এমন কেহই ছিলনা যে, পাগ্‌লা দাশুকে না চিনে। যে লোক আর কাহাকেও জানে না, সেও সকলের আগে “পাগ্‌লা দাশুকে” চিনিয়া লয়। সেবার একজন নূতন দারোয়ান আসিল, একেবারে আন্‌কোরা পাড়াগেঁয়ে

লোক; কিন্তু প্রথম যখন সে পাগ্‌লা দাশুর নাম শুনিল, তখনই সে আন্দাজে ঠিক ধরিয়া লইল যে, এই ব্যক্তিই পাগ্‌লা দাশু। কারণ তার মুখের চেহারায়, কথা বার্ত্তায়, চলনে চালনে বোঝা যাইত যে তাহার মাথায় একটু "ছিট্" আছে।

তাহার চোক দুটি গোল গোল, কাণ দুটা অনাবশ্যক রকমের বড়, মাথায় এক বস্তা ঝাঁকড়া চুল। চেহারাটা দেখিলেই মনে হয়—

ক্ষীণদেহ খর্ব্বকায় মুণ্ড তাহে ভারি
যশোরের কই যেন নরমূর্ত্তিধারী।

সে যখন তাড়াতাড়ি চলে অথবা ব্যস্ত হইয়া কথা বলে, তখন তাহার হাত পা ছোঁড়ার ভঙ্গী দেখিয়া হঠাৎ কেন জানি চিংড়ি মাছের কথা মনে পড়ে।

সে যে বোকা ছিল, তাহা নয়। অঙ্ক কষিবার সময়, বিশেষতঃ লম্বা লম্বা গুণ-ভাগের বেলা, তাহার আশ্চর্য্য মাথা খুলিত। আবার এক এক সময় সে আমাদের বোকা বানাইয়া তামাসা দেখিবার জন্য এমন সকল ফন্দি বাহির করিত যে, আমরা তাহার বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতাম।

"দাশু," অর্থাৎ দাশরথি, যখন প্রথম আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি হয় তখন জগবন্ধুকে আমাদের ক্লাসের "ভালছেলে" বলিয়া সকলে জানিত। সে পড়াশুনায় ভাল হইলেও, তাহার মত অমন একটি হিংসুটে ভিজেবেড়াল আমরা আর দেখি নাই। দাশু একদিন জগবন্ধুর কাছে কি একটা ইংরাজি পড়া জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিল। জগবন্ধু পড়া বলিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে বেশ দু'কথা শোনাইয়া বলিল "আমার বুঝি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই? আজ এঁকে ইংরিজি বোঝাব, কাল ওঁর অঙ্ক কষে দেব, পরশু আর একজন আসবেন আর এক ফরমাইস নিয়ে—ঐ করি আর কি!" দাশু সাংঘাতিক চটিয়া বলিল "তুমি ত ভারি ছ্যাঁচড়া ছোটলোক হে!" জগবন্ধু পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে নালিশ করিল, "ঐ নতুন ছেলেটা আমায় গালাগালি দিচ্ছে।" পণ্ডিত মহাশয় দাশুকে এমনি দু'চার ধমক দিয়া দিলেন যে, সে বেচারা একেবারে দমিয়া গেল।

তারপর কয়দিন দাশু জগবন্ধুর সহিত কথা বার্ত্তা কহে নাই। পণ্ডিত মহাশয় রোজ ক্লাসে আসেন, আর যখন দরকার হয় জগবন্ধুর কাছে বই চাহিয়া ল'ন। একদিন তিনি পড়াইবার সময় "উপক্রমণিকা" চাহিলেন, জগবন্ধু তাড়াতাড়ি তাহার সবুজ কাপড়ের মলাট দেওয়া "উপক্রমণিকা" খানা বাহির করিয়া দিল। পণ্ডিত মহাশয় বইখানি খুলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বইখানা কার?"

জগবন্ধু বুক ফুলাইয়া বলিল, "আমার।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন "হুঁ,—নূতন সংস্করণ বুঝি? বইকে-বই একেবারে বদ্‌লে গেছে" এই বলিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন —"যশোবন্ত দারোগা—লোমহর্ষক ডিটেক্‌টিভ নাটক।" জগবন্ধু ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত তাকাইয়া রহিল। পণ্ডিত মহাশয় বিকট রকম চোখ পাকাইয়া বলিলেন, "স্কুলে আমার আদুরে গোপাল, আর বাড়ীতে বুঝি নৃসিংহ অবতার?" জগবন্ধু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় এক ধমক দিয়া বলিলেন, "থাক থাক আর ভালমানুষি দেখিয়ে কাজ নেই—ঢের হ'য়েছে।" লজ্জায়, অপমানে জগবন্ধুর দুই কাণ লাল হইয়া উঠিল—আমরা সকলেই তাহাতে বেশ খুসী হইলাম। পরে জানা গেল যে, এটি দাশু ভায়ার কীর্ত্তি, সে মজা দেখিবার জন্য উপক্রমণিকার জায়গায় ঠিক ঐরূপ মলাট দেওয়া একখানা বই রাখিয়া দিয়াছিল!

দাশুকে লইয়া আমরা সর্ব্বদাই ঠাট্টাতামাসা করিতাম—এবং তাহার সামনেই তাহার বুদ্ধি ও চেহারা সম্বন্ধে অনেক অপ্রীতিকর আলোচনা করিতাম। তাহাতে বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার ভাব গতিক দেখিয়া মনে হইত যেন সে বেশ আমোদ পাইতেছে। এক এক সময়ে সে নিজেই উৎসাহ করিয়া আমাদের মন্তব্যের উপর রং চড়াইয়া নিজের সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গল্প বলিত। একদিন সে বলিল "ভাই, আমাদের পাড়ায় যখনই কেহ আমসত্ত বানায় তখনই আমার ডাক পড়ে। কেন জানিস্?" আমরা বলিলাম "খুব আমসত্ত খাস্ বুঝি?" সে বলিল "তা নয়। যখন আমসত্ত শুকোতে দেয় আমি সেই খানে ছাতের উপর বার দুয়েক এই চেহারাখানা দেখিয়ে আসি। তাতেই, পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে যত কাগ সব ত্রাহি ত্রাহি ক'রে ছুটে পালায়। কাজেই আর আমসত্ত পাহারা দিতে হয় না!"

প্রত্যেক বার ছুটির পরে স্কুলে ফিরিবার সময় দাশু একটা না একটা কাণ্ড বাধাইয়া আসে। একবার সে হঠাৎ পেণ্টেলুন পরিয়া স্কুলে হাজির হইল। ঢলঢলে পায়জামার মত পেণ্টেলুন আর তাকিয়ার খোলের মত কোট পরিয়া তাহাকে যে কিরূপ অদ্ভুত দেখাইতেছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতেছিল—এবং সেটা তাহার কাছে ভারি একটা আমোদের ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "পেণ্টেলুন পরেছিস্ কেন?" দাশু এক গাল হাসিয়া বলিল, "ভাল করে ইংরাজি শিখ্‌ব বলে।" আর একবার সে খামখা নেড়া মাথায় এক পট্টি বাঁধিয়া ক্লাসে আসিতে আরম্ভ করিল এবং আমরা সকলে তাহা লইয়া ঠাট্টা তামাসা করায় যার পর নাই খুসী হইয়া উঠিল। দাশু আদবেই

গান গাইতে পারে না—তাহার যে তালজ্ঞান বা সুরজ্ঞান একেবারেই নাই, এ কথা সে বেশ জানে। তবু সেবার ইনস্পেক্টার সাহেব যখন স্কুল দেখিতে আসেন, তখন আমাদের খুসী করিবার জন্য সে চীৎকার করিয়া গান শুনাইয়াছিল। আমরা কেহ ওরূপ করিলে সেদিন রীতিমত শাস্তি পাইতাম, কিন্তু দাশু "পাগ্‌লা" বলিয়া কেহ তাহাকে কিছু বলিল না।

ছুটির পরে দাশু নূতন কি পাগ্‌লামি করে, তাহা দেখিবার জন্য আমরা ব্যস্ত হইয়া স্কুলে আসিতাম। কিন্তু যেবার সে অদ্ভুত এক বাক্স বগলে লইয়া ক্লাসে হাজির হইল তখন আমরা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। আমাদের মাষ্টার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে দাশু, ও বাক্সের মধ্যে কি এনেছ?" দাশু বলিল, "আজ্ঞে, আমার জিনিষপত্র।" 'জিনিষপত্র'টা কিরূপ হইতে পারে এই লইয়া আমাদের মধ্যে বেশ একটু তর্ক হইয়া গেল। দাশুর সঙ্গে বই, খাতা, পেন্‌সিল, ছুরি সবই ত আছে, তবে আবার জিনিষপত্র কিরে বাপু? দাশুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সোজাসুজি কোন উত্তর না দিয়া বাক্সটিকে আঁকড়াইয়া ধরিল এবং বলিল "খবরদার আমার বাক্স তোমরা কেউ ঘেঁটো না।" তাহার পর চাবি দিয়া বাক্সটাকে একটুখানি ফাঁক করিয়া সে তাহার ভিতরে চাহিয়া কি যেন দেখিয়া লইল, এবং "ঠিক আছে" বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বিড় বিড় হিসাব করিতে লাগিল। আমি একটুখানি দেখিবার জন্য উঁকি মারিতে গিয়াছিলাম—অমনি পাগ্‌লা মহা ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরাইয়া বাক্স বন্ধ করিয়া ফেলিল।

ক্রমে আমাদেব মধ্যে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হইল। কেহ বলিল, "ওটা ওর টিফিনের বাক্স—ওর মধ্যে খাবার আছে।" কিন্তু একদিনও টিফিনের সময়ে তাহাকে বাক্স খুলিয়া কিছু খাইতে দেখিলাম না। কেহ বলিল, "ওটা বোধ হয় ওর মণি-ব্যাগ —ওর মধ্যে টাকা পয়সা আছে, তাই ও সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখ্‌তে চায়।" আর এক জন বলিল, "টাকা পয়সার জন্য অত বড় বাক্স কেন? ওকি ইস্কুলে মহাজনী কারবার খুলবে নাকি?"

একদিন টিফিনের সময়ে দাশু হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বাক্সের চাবিটা আমার কাছে রাখিয়া গেল আর বলিল "এটা এখন তোমার কাছে রাখ দেখো হারায় না যেন। আর আমার আসতে যদি একটু দেরী হয় তবে তোমরা ক্লাসে যাবার আগে ওটা দরোয়ানের কাছে দিয়ে দিও।" এই কথা বলিয়া সে বাক্সটা দরোয়ানের জিম্মায় রাখিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন আমাদের উৎসাহ দেখে কে! এতদিনে সুবিধা পাওয়া গিয়াছে; এখন হতভাগা দরোয়ানটা একটু তফাৎ গেলেই হয়। খানিক বাদে দরোয়ান তাহার রুটি পাকাইবার লোহার উনানটি ধরাইয়া কতকগুলা বাসনপত্র লইয়া কলতলার দিকে গেল। আমরা এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, দরোয়ান আড়াল হওয়া মাত্র আমরা পাঁচ সাত জনে তাহার ঘরের কাছে সেই বাক্সের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তারপর আমি চাবি দিয়া বাক্স খুলিয়া দেখি, বাক্সের মধ্যে বেশ ভারি একটা কাগজের পোঁট্‌লা নেকড়ার ফালি দিয়া খুব করিয়া জড়ান। তারপর, তাড়াতাড়ি পোঁটলার প্যাঁচ খুলিয়া দেখা গেল তাহার মধ্যে একখানা কাগজের বাক্স—তার ভিতরে আর একটি ছোট পোঁটলা। সেইটি খুলিয়া একখানা কার্ড বাহির হইল তাহার একপিঠে লেখা "কাঁচকলা খাও" আর এক পিঠে লেখা "অতিরিক্ত কৌতূহল ভাল নয়।" দেখিয়া আমরা এ-উহার মুখে চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলাম। সকলের শেষে একজন বলিয়া উঠিল "ছোকরা আচ্ছা যা হোক, আমাদের বেজায় ঠকিয়েছে।" আর একজন বলিল "যেমন ভাবে বাঁধা ছিল তেমনি ক'রে রেখে দাও, সে যেন টের না পায় যে আমরা খুলেছিলাম। তা হ'লে সে নিজেই জব্দ হবে।" আমি বলিলাম "বেশ কথা। ও ছোকরা আসলে পরে তোমরা খুব ভাল মানুষের মত বাক্সটা দেখাতে ব'লো—আর ওর মধ্যে কি আছে, সেটা বা'র ক'রে জানতে চেয়ো।" তখন আমরা তাড়াতাড়ি কাগজ পত্র গুলি বাঁধিয়া আগেকার মত পোঁটলা পাকাইয়া বাক্সে ভরিয়া ফেলিলাম।

বাক্সে চাবি দিতে যাইতেছি এমন সময় হো হো করিয়া একটা হাসির শব্দ শুনা গেল—চাহিয়া দেখি পাঁচিলের উপরে বসিয়া পাগ্‌লা দাশু হাসিয়া কুটিকুটি। হতভাগা এতক্ষণ চুপি চুপি তামাসা দেখিতেছিল আর আমাদের কথাবার্ত্তা সমস্ত শুনিতেছিল! তখন বুঝিলাম, আমার কাছে চাবি দেওয়া দরোয়ানের কাছে, বাক্স রাখা, টিফিনের সময় বাইরে যাওয়ার ভাণ করা, এ সমস্তই তাহার সয়তানী। আসল মৎলবটি, আমাদের খানিকটা নাচাইয়া তামাসা দেখান। খামখা আমাদের আহাম্মক বানাইবার জন্যই সে মিছামিছি একয়দিন ধরিয়া ক্রমাগত একটা বাক্স বহিয়া বেড়াইয়াছে। সাধে কি বলি "পাগ্‌লা" দাশু?

অসুরের দেশ।

যে জাতি শিল্পে বাণিজ্যে বেশ অগ্রসর, যাহারা লেখাপড়ার চর্চ্চা করে, হিসাব করিয়া পাকা দালান ইমারৎ গাঁথিতে জানে, এবং নানারূপ ধাতুও অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহারে বেশ অভ্যস্ত, মোটের উপর তাহাকে সভ্য জাতি বলা যায়। ইতিহাসের প্রাচীন যুগে যে সকল সভ্য জাতির নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে একটা জাতির কথা শুমি যাহার নাম অসুর বা আশুর। ইংরাজিতে তাহাকে বলে আসিরিয়া (Assyria)। এই অসুর দেশের নাম প্রাচীন বাইবেল প্রভৃতি পুরাতন পুঁথিতে অনেক স্থানে পাওয়া যায় এবং একশত বৎসর আগে এই দেশের সঙ্গে মানুষের ওইটুকু মাত্র পরিচয় ছিল। মানুষ অসুরের দেশ ও তাহার রাজধানী নিনেভের কাহিনী কেবল পুথিতেই পড়িয়া আসিত কিন্তু তাহার চেহারা কেহ চোখে দেখে নাই। কারণ, যেখানে সহর ছিল সে স্থানে খোঁজ করিতে গেলে কেবল মাটির ঢিপি আর প্রকাণ্ড ময়দান ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইত না।

এই অসুরের সঙ্গে আমাদের পুরাণের অসুরদের কোন সম্পর্ক আছে কি না তাহা আমি জানি না। এখন মেসেপটেমিয়ার যেখানে ইংরাজের সহিত তুর্কীর লড়াই চলিতেছে তাহার প্রায় তিনশত মাইল উত্তরে প্রাচীন অসুরের দেশ ছিল। ইহা কেবল আন্দাজের কথা নয়—বাস্তবিকই সেখানে ময়দান খুঁড়িয়া মানুষে সেই পুরাতন লুপ্ত সহরকে বাহির করিয়াছে। প্রায় সাড়ে চার হাজার বৎসরের পুরাতন সহর, সেখানে এই অসুর জাতি দুহাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া পরে যুদ্ধ বিগ্রহে একেবারে ধ্বংস পায়। সেও প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগেকার কথা—তখনও বুদ্ধের জন্ম হয় নাই!

কথায় বলে "সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।" এক একজন লোক থাকে, তাহাদের অন্নবস্ত্রের অভাব নাই, সংসারে বিশেষ কোন দুঃখ নাই, অথচ তাহাদের কি যে খেয়াল, তাহারা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া একটা কোন হাঙ্গামা লইয়া ব্যস্ত থাকে। উত্তরে দক্ষিণে বরফের দেশে, আফ্রিকার মরু ভূমিতে, পাহাড়ের চূড়ায় তাহারা অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ মাথা-পাগলা লোকের দ্বারা জগতের অনেক বড় বড় আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে। অসুরের রাজ্য আবিষ্কারও এইরূপেই হয়। লেয়ার্ড (Layard) নামে এক ইংরাজ সিংহলে কি একটা ভাল চাকরি পাইয়া এ দেশে আসিতেছিলেন। সোজা পথে জাহাজে চড়িয়া আসিলেই হইত, কিন্তু তাঁহার সখ হইল ডাঙ্গার পথে মেসোপটেমিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেখিয়া তিনি এদেশে আসিবেন।

কিন্তু ওই যে খেয়ালের মাথায় তিনি মেসোপটেমিয়া গেলেন উহাতেই তাঁহার সব কাজ কর্ম্ম উল্টাইয়া গেল। মেসোপটেমিয়ার উত্তরে বেড়াইবার সময় তাঁহার মনে হইল, এই ত সেই প্রাচীন সভ্য জাতির দেশ, এখানে খুঁজিলে কি তাহাদের চিহ্ন পাওয়া যায় না? তাঁহার আর চাকুরি করা হইল না—তিনি কতকগুলি মজুর লইয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিলেন! খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাঁহার সঙ্গের টাকা পয়সা সব ফুরাইয়া আসিল, তিনি আবার টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার দেখাদেখি আরও দু'চারটি লোক আসিয়া মাটিখোঁড়া ব্যাপারে যোগ দিল। তখন তুর্কি রাজ-কর্ম্মচারীদের মনে সন্দেহ জাগিল, "এই লোকগুলা খামখা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়া মাটি কাটিতে চায় কেন? নিশ্চয়ই ইহাদের মনে কোন দুষ্ট মৎলব আছে।" সুতরাং তাহারা মাটি কাটা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিল। তারপর যখন মাটির ভিতর হইতে নানারকম অদ্ভুত মূর্ত্তি আর ঘর-বাড়ী বাহির হইতে লাগিল, তখন এ আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া সে দেশী মজুরগুলা এমন ঘাবড়াইয়া গেল যে, তাহারাও কাজ করিতে চায় না। ইহার উপর সে দেশে নানারকম হিংস্র জন্তুর অত্যাচার ও জ্বর-জারির উৎপাত ত ছিলই।

অসুর দেশের নরসিংহমূর্ত্তি।

এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তির মাথাটা যখন বাহির হয় তখন মজুরেরা ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পলাইয়াছিল।

যাহা হউক, অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে—ইংরাজ ও ফরাসি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে শেষটায় মাটির নীচ হইতে একেবারে অসুরের রাজধানী বাহির হইয়া পড়িল। সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কবে আড়াই হাজার বছর আগে সে সহর ধ্বংস হইয়াছে, লোকজন কোন্ কালে সে দেশ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, অথচ এতদিন পরে তাহাদের সেই

পুরাতন কীর্ত্তিগুলি আবার কঙ্কালের মত মাটির নীচ হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে।

সেকালের ইতিহাসে জানা যায় যে, নিনেভে সহর শত্রুর হাতে পড়িয়া আগুনে নষ্ট হয়—তাহার প্রমাণ এখনও চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আগুনেও সব নষ্ট করিতে পারে নাই। এখনও কত মূর্ত্তি, কত কারুকার্য্য, আর পাথরে আঁকা কত ছবি আছে, যাহা দেখিলে মনেই হয় না যে এগুলি সেই লুপ্তযুগের জিনিষ। সেই সময়ে যে সকল রং ব্যবহার হইত সেই রং গুলি পর্য্যন্ত এক এক জায়গায় বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। এক একটি ঘরের ছাদ, দেয়াল প্রভৃতি এমন অবস্থায় আছে যে সমজদার লোকে তাহা দেখিয়া বলিতে পারে নূতন অবস্থায় ঘরটি ঠিক

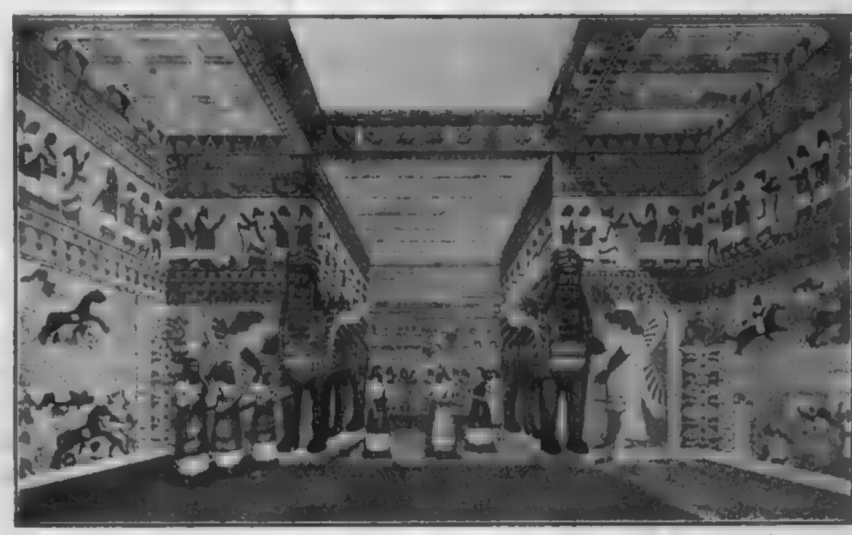

অসুরের রাজপ্রাসাদ।

কি রকম ছিল। এই সকল ছবি ও মূর্ত্তি দেখিলে বোঝা যায় যে, সে দেশের লোকদের বেশ সৌন্দর্য্য জ্ঞান ছিল। ছবির মধ্যে লড়াই ও শিকারের ছবিই খুব বেশী—মাঝে মাঝে রাজা-রাজড়ার ছবিও আছে। ছবি দেখিয়া সে দেশের লোকদের অস্ত্র শস্ত্র, পোষাক ও চেহারা সম্বন্ধে অনেক খবর জানা যায়। অসুরের দল আর তাহাদের

শত্রুর দলের মধ্যে এ বিষয়ে কিরূপ তফাৎ ছিল তাহাও অনেক ছবিতে পরিষ্কার দেখান হইয়াছে। অসুরেরা বড়ই যুদ্ধপ্রিয় ছিল, এবং প্রায়ই অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে লড়াই লইয়া ব্যস্ত থাকিত।

অসুরদের কথা বলিতে হইলে তাহাদের ভাষার কথাও বলিতে হয়। সে ভাষায় এখন আর কেহ কথা বলে না, সে দেশের লোকেরা পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ সংবাদ জানে না—ভাষার একমাত্র চিহ্ন সেকালের অক্ষর। মাটির উপর বাটালি দিয়া তীরের ফলকের মত অদ্ভুত সব আঁচড় কাটিয়া অক্ষর লেখা হইত। সেই মাটি পোড়াইয়া ইঁটের "পুথি" তৈয়ারী হইত। একশত বৎসর আগে, সে অক্ষর পড়িতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে ছিল না। অথচ আজ কাল পণ্ডিতেরা এই সব আঁচড় পড়িয়া তাহা হইতে কত সংবাদ কত ইতিহাস উদ্ধার করিতেছেন! বিদ্যা বুদ্ধিও বাণিজ্যে বাবিলনের লোকেরা অসুরদের চাইতে অনেক বেশী অগ্রসর ছিল সুতরাং তাহাদের ভাষা ধর্ম্ম শিল্প সাহিত্য আইন কানুন প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েই অসুরেরা বাবিলনের অল্পাধিক অনুকরণ করিত। একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে, বাবিলনের অক্ষরের পাশে পারস্যের অক্ষরে লেখা একটা যুদ্ধের বর্ণনা দেখিয়া

একজন ইংরাজ পণ্ডিত এই দুয়ের তুলনা করিয়া বাবিলনের অক্ষরের সঙ্কেত বাহির

করেন। এইভাবে গ্রীক অক্ষরের সাহায্যে ইজিপ্টের অদ্ভুত ছবিওয়ালা অক্ষরের রহস্য বাহির করা হয়। এই সকল পুরাতন অক্ষরে লেখা ইঁটের পুঁথি, কীর্ত্তিস্তম্ভ বা খোদাই করা পাহাড় প্রভৃতি হইতে অসুরদের ইতিহাসের অনেক কথা জানা গিয়াছে। অনেক রাজার নাম ও তারিখ অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা, ছোট বড় নানা জাতির সহিত সন্ধিও বিবাদের সংবাদ এ সমস্তই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অসুরদের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর ধনুক। তাহারা ঘোড়ায় ও রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিত, সঙ্গে পদাতিক সৈন্যও থাকিত। যেমন যোদ্ধা তেমনি শিকারী, আমাদের দেশের মত অসুরের দেশেও সেকালের রাজারা মৃগয়া করিতেন। হিংস্র জন্তু নষ্ট করিয়া প্রজাকে রক্ষা করা রাজারই কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য হইত।

অসুরে রাজাদের বীরত্বের কথা বলিতে গেলে একজনের কথা বিশেষভাবে বলা উচিত তাঁহার নাম টিগ্‌লাৎ-পিলেসের। তিন হাজার বৎসর আগে ইনি অসুর দেশের

রাজা হইয়া নানা দেশ জয় করেন। তাঁহার শাসনে অসুরের রাজ্য ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইনি যখন উত্তরে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হ'ন তখন

বাবিলনের সৈন্যেরা তাঁহার রাজ্য আক্রমন করে এবং রাজ মন্দিরের দেবমূর্ত্তি চুরি করিয়া লইয়া যায়। টিগ্‌লাৎ-পিলেসের ইহার প্রতিশোধের জন্য বাবিলন আক্রমন করেন ও তাহার রাজধানী পর্য্যন্ত লুটিয়া অনেকখানি দেশ অধিকার করিয়া ফেলেন। একদিকে যেমন যোদ্ধা, অন্যদিকে টিগ্‌লাৎ-পিলেসের একজন অসাধারণ শক্তিশালী শিকারী ছিলেন। হাতী সিংহ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তু তিনি নিজের হাতে তীর, ধনুক ও তলোয়ার লইয়া শিকার করিতেন। তিনি রথে চড়িয়া প্রকাণ্ড দশটা হাতী ও প্রায় আট শত সিংহ শিকার করেন—ইহা ছাড়া পায়ে হাঁটিয়া যে সকল সিংহ মারেন তাহার সংখ্যাও এক শতের উপর হইবে।

টিগ্‌লাৎ পিলেসের মারা গেলে পর অসুরদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া পড়ে। তাহাদের প্রকাণ্ড রাজ্য ক্রমেই ছোট হইতে থাকে। প্রায় দুই শত বৎসর পরে আরও কয়েকটি শক্তিশালী রাজার আবির্ভাব হয় এবং ইঁহারা আবার দেশকে জাগাইয়া তোলেন। এই সকল রাজাদের মধ্যে অসুর-নসির-পালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রাজত্বকালের নানারূপ চিহ্ন ও পরিচয় খুব প্রচুর পরিমানে পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে দেখা যায় যে ইনি এক দিকে যেমন সৌখিন, অপর দিকে যুদ্ধের সময় তেমনি হিংস্র ও নিষ্ঠুর ছিলেন। দেশ বিদেশের লোক তাঁহার নামে ভয়ে কাঁপিত।

ইঁহার রাজত্বের পর হইতে ক্রমে আবার অসুরদের অবনতি আরম্ভ হয়। তারপর অসুররাজকুলের শেষ যোদ্ধা মহাবীর অসুর-বাণি-পালের সময়ে আর একবার এ দেশ মাথা তুলিয়া উঠে। উৎসাহের চোটে অসুরেরা একেবারে আফ্রিকায় গিয়া ইজিপ্ট জয় করিয়া ফেলিল—দক্ষিণে আরবের মরুভূমিতে সসৈন্যে হাজির হইল। কিন্তু ইহাই তাহাদের শেষকীর্ত্তি। ক্রমাগত যুদ্ধবিদ্রোহের ফলে সমস্ত জাতি যখন অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন প্রবল শত্রুরাও সুযোগ বুঝিয়া চারিদিক হইতে তাহাদের রাজ্য লুটিয়া লইল। অবশেষে পারস্যের দুর্দ্দান্ত সেনাদল আসিয়া তাহাদের রাজধানী ঘিরিয়া ফেলিল। নিনেভে সহরের চারিদিকে প্রকাণ্ড দেয়াল ঘেরা। এই দেয়ালের জোরে অসুরেরা তিনবৎসর ধরিয়া তাহাদের প্রাচীন সহরের জন্য লড়াই করিল—কিন্তু অবশেষে হার মানিতেই হইল। তারপর এতদিনের সাধের সহর শত্রুর হাতে পড়িয়া একেবারে ছারখার হইয়া গেল।

কোথায় বা অসুর রাজ্য—আর কোথায় বা সেই অসুর জাতি। দু'হাজার বছর সারা দেশ কাঁপাইয়া যাহারা রাজত্ব করিল, এখন কেই বা তাহাদের খবর রাখে। অত বড়

নিনেভে সহর, সেও মাটির নীচে কবর চাপা পড়িল। এখন আবার লোকে সেই কবর খুঁড়িয়া তাহার কঙ্কাল বাহির করিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখ শ্মশানের মত দেশ, লোক নাই জন নাই, আছে কেবল মৃত সহরের জীর্ণ কঙ্কাল, আর রাত্রের অন্ধকারে সিংহের হুঙ্কার।

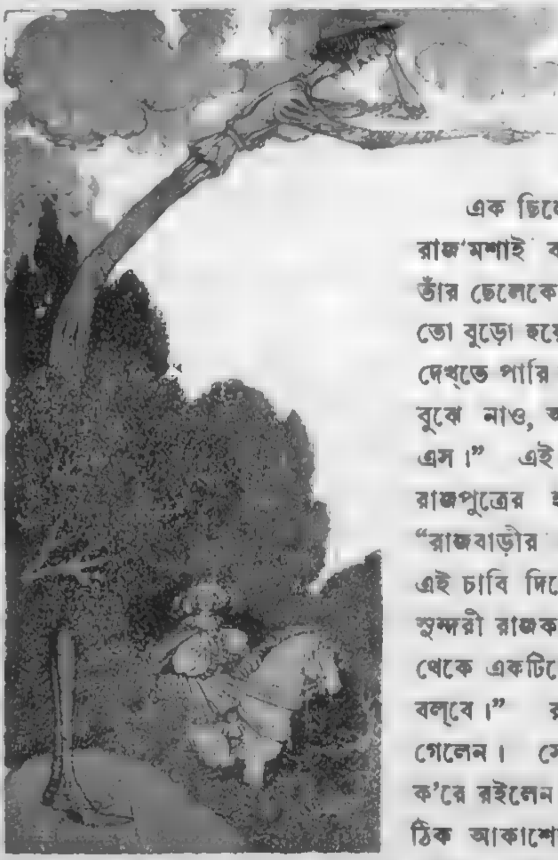

তিন বন্ধু।

এক ছিলেন রাজা—তাঁর ছিল এক ছেলে। রাজ'মশাই বড্ড বুড়ো হয়েছেন; তাই তিনি তাঁর ছেলেকে ডেকে বল্লেন, "দেখ বাবা, আমি তো বুড়ো হয়েছি, কাজ কর্ম্ম আর ভাল ক'রে দেখ্‌তে পারি না। এখন তুমি আমার রাজকর্ম্ম বুঝে নাও, আর একটি সুন্দর লক্ষ্মী বৌ নিয়ে এস।" এই ব'লে তিনি একটা সোণার চাবি রাজপুত্রের হা'তে দিলেন, আর বল্‌লেন, "রাজবাড়ীর ছাতের দক্ষিণ কোণার ঘরটিকে এই চাবি দিয়ে খুলে, তার ভিতরে গিয়ে যে সুন্দরী রাজকন্যাদের ছবি দেখ্‌বে, তাদের মধ্যে থেকে একটিকে পছন্দ ক'রে আমায় এসে বল্‌বে।" রাজপুত্র তখনই সেই ঘরটিতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি একেবারে হাঁ ক'রে রইলেন! ঘরটি গোল আর তার ছাত ঠিক আকাশের মত নীল; তার উপর সোণা রূপোর তারা ঝল্‌মল্ করছে। ঘরের চারিদিকে সোণা দিয়ে বাঁধান বারটি জানালা; তার প্রত্যেকটির উপর চমৎকার পোষাক

পরা একটি সুন্দরী রাজকন্যার ছবি আঁকা। তার মধ্যে কে যে বেশী সুন্দরী তাই সে আর ঠিক কর্‌তে পারছে না। এমন সময় সে দেখ্‌ল যে একটি জানালা পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। তাড়াতাড়ি সে পর্দ্দা উঠিয়ে দেখে কি,—একটি অতি সুন্দরী রাজকন্যার ছবি। তার পোষাক কিন্তু একেবারে সাদাসিধে আর মাথায় মুক্তার মুকুট। বেচারার কিন্তু বড় বিষণ্ণ চেহারা ;—যেন তার কত দুঃখ।

সেই রাজকন্যাকেই সে পছন্দ কর্‌ল, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্য সব ছবি কোথায় মিলিয়ে গেল। রাজপুত্র বড়ই আশ্চর্য্য হয়ে, তখনই তার বাবাকে সব কথা জানাল। রাজামশাই তো সব শুনে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়্‌লেন,—"সর্ব্বনাশ! এই রাজকন্যাকে যে দুষ্ট যাদুকরে লোহার বাড়ীতে আটক ক'রে রেখেছে ; যে একে ছাড়াতে যায় সেই যে আর ফেরে না! তোমার কপালে যে কত দুঃখ আছে, তা' আর কি বল্‌ব। এখন তো আর কোন উপায় নাই। পছন্দ যখন করেছ, তখন তার খোঁজে যাও!"

তখনই রাজপুত্র একটা খুব তেজী ঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়্‌ল। অনেক দূর গিয়েছে সে, এমন সময় শুন্‌তে পেল, কে যেন বল্‌ছে,—"আরে থামো না! থামো না!" রাজপুত্র অমনি পিছন ফিরে দেখ্‌ল যে এয়া লম্বা একটা লোক তাকে বল্‌চে, "ওহে, আমাকে তোমার সঙ্গে নাও, দেখ্‌বে তোমার কত কাজ ক'রে দিতে পারি আমি।" রাজপুত্র বল্‌ল, "তোমার নাম কি? আর তুমি কর্‌তেই বা পার কি?" সে বল্‌ল, "আমার নাম ঢেঙারাম। আমি যত ইচ্ছা লম্বা হ'তে পারি। ঐ যে তালগাছের আগায় বাবুইএর বাসা দেখ্‌ছ, ওটিকে আমি এখনই পেড়ে দিতে পারি ;—তাতে আমার গাছে চড়্‌বারও দরকার হবে না।" এই ব'লেই সে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তালগাছের মত লম্বা হয়ে গেল আর পাখীর বাসাটি পেড়ে নিয়েই চট্‌ করে আবার বেঁটে হ'য়ে গেল। রাজপুত্র বল্‌ল, "তা' তো দেখ্‌লাম ; কিন্তু ওতে আমার কি সাহায্য হবে? এই বনটা পার হবার রাস্তা যদি বল্‌তে পার তবে বুঝব আমার সাহায্য করলে।" ঢেঙারাম আবার লম্বা হ'তে লাগ্‌ল আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে তালগাছ ছাড়িয়ে কোথায় তার মাথা উঠ্‌ল। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখে বল্‌ল, "ঐ যে রাস্তা দেখা যাচ্ছে।" তারপর সে আবার বেঁটে হয়ে, ঘোড়ার লাগাম ধরে পথ দেখিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। খানিক দূর গিয়ে বল্‌ল, 'ঐ যে আমার বন্ধু যাচ্ছে। ওকে ধরে নিয়ে আসি।" ব'লেই সে চট্‌ করে আকাশের মত লম্বা হয়ে গেল আর এয়া লম্বা দুই পা ফেলে তার বন্ধুর কাছে গিয়ে

উপস্থিত হ'লো। তারপর আর কোন কথাবার্তা না ব'লে তাকে হাতে ধরে উঠিয়ে নিয়ে রাজপুত্রের কাছে চ'লে এল। বন্ধুটির বেশ বণ্ডামার্ক চেহারা। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি? আর কিই বা করতে পার তুমি?" লোকটি বল্ল, "আমি ভোঁদারাম। আমি নিজেকে ফুলিয়ে প্রকাণ্ড বড় হয়ে যেতে পারি। কিন্তু এই বেলা ঘোড়া ছুটিয়ে পালাও, নইলে আমি এত তাড়াতাড়ি ফুলে উঠ্‌ব যে ভারি বিপদে পড়বে, এই বলেই সে ফুটবলের মত ফুলতে আরম্ভ করল। ঢেঙারাম তো আগেই দৌড় দিয়েছে। রাজপুত্রও দেখাদেখি ঘোড়া ছুটিয়ে স'রে পড়তে লাগলেন। ফুলে ফুলে পাহাড়ের মত বড় হয়ে ভোঁদারাম হঠাৎ আবার ছোট হ'তে আরম্ভ করল। পেটে যত বাতাস ভরে ছিল সব ছেড়ে দিতে তার মুখে থেকে এম্নি জোরে বাতাস ছুটতে লাগ্‌ল যে ঝড়ের বাতাস কোথায় লাগে! তা' দেখে রাজপুত্র বল্‌ল, "বেশ, এমন লোক সচরাচর মেলে না। তুমি আমাদের সঙ্গে চল।" এই ব'লে তারা তিনজনে এগুতে লাগ্‌ল।

খানিক দূর গিয়ে রাজপুত্র দেখ্‌ল একটি লোক চোখে পট্টি বেঁধে রাস্তা দিয়ে চ'লেছে। ঢেঙারাম বল্‌ল, "ঐ আমাদের আরেক বন্ধু,"। রাজপুত্র সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কেহে? অমন ক'রে যে চোখে বেঁধে রাস্তা দিয়ে চ'লেছ, পথ দেখ্‌বে কেমন ক'রে?"

লোকটি বল্ল, "আমার নাম আগুণেচোখ। তোমরা খোলা চোখে যা দেখ, আমি চোখ বেঁধে রাখ্‌লেই তা' দেখ্‌তে পাই। খোলা চোখে দেখলে যত মোটা জিনিষই হোক না কেন, তার এপার ওপার স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই। ভাল ক'রে কোন জিনিষের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাক্‌লে সেটা হয় হাজার টুক্‌রো হয়ে ভেঙে যায়, না হয় পুড়ে ছাই হয়ে যায়।" এই ব'লেই সে চোখের বাঁধন খুলে সাম্‌নের একটা পাহাড়ের দিকে কটমট ক'রে চেয়ে রইল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাহাড়টা ফেটে, ভেঙে চূরমার হয়ে একটা বালির ঢিপি হয়ে গেল, আর তার ভিতর থেকে এক তাল সোণা বের হ'লো। আগুণেচোখ সেই সোণার তালটা রাজপুত্রকে দিল।

রাজপুত্র খুব খুসী হয়ে বল্‌ল, "দেখ তো সেই রাজকন্যা কি করছেন, কোথায় তিনি আছেন, আর এখান থেকে কত দূর?"

আগুণে চোখ বল্‌ল, "ঐ যে তিনি একলা সেই লোহার বাড়ীতে বন্ধ হয়ে ব'সে ব'সে কাঁদছেন। ওঃ সে যে অনেক লম্বা রাস্তা। এমনি ক'রে ঘোড়ায় চড়ে গেলে যে এক বছরেও সেখানে পৌঁছাতে পারবে না। অবশ্য ঢেঙারাম যদি নিয়ে যায় তবে

সন্ধ্যার আগেই সেখানে পৌঁছে যাব।" অমনি ঢেণ্ডারাম আর তিনজনকে কাঁধে নিয়ে রওয়ানা হ'লো। সন্ধ্যার সময় সেই লোহার বাড়ীর দরজায় তারা পৌঁছে দেখ্‌ল দরজা খোলা রয়েছে। তাই দেখে যেই তারা ভিতরে ঢুকেছে, অমনি দরজা দড়াম্ করে বন্ধ হয়ে গেল আর তারা সেই বাড়ীর মধ্যে বন্দী হয়ে গেল। তখন কি আর করে—তারা এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে সব দেখ্‌তে লাগল। চারিদিকে অনেক লোকজন, তাদের খুব জমকাল পোষাক, কিন্তু কেউ নড়ে চড়ে না—সব যেন পাথর হয়ে রয়েছে।

(ক্রমশঃ)

লাল রং।

লাল রং বাজারেতে কিনিতে যে পাই,
প্রাণীদের রক্ত লাল দেখেছ ত ভাই!
পান খেলে লাল ঠোঁট করে টুকটুক,
কোকিলের চক্ষু লাল, চন্দানর মুখ।
মখমলী পোকা, নাম বীরবৌটী বলে,
আষাঢ়ে পড়িলে জল দেখি দলে দলে।
বাগানেতে নানা জাতি ফুটে লাল ফুল—
লাল বক, লাল জবা, সেঁজুতি পারুল;
অশোক, শিমুল আর ডালিম পলাশ,
কেহ হয় গন্ধহীন, কেহ অল্প বাস;
গোলাপ, করবী ফুল বাঁধুলিকাঞ্চন,
সর্ব্বজয়া কৃষ্ণচূড়া লোহিত বরণ।
কোকনদ, লাল সুঁদি পুকুরের জলে,
লালের বাহার কত দেখি ফুলে ফলে।
কত কীট, কত পাখী দেখি রাঙা বেশ,
বিধাতার রাজ্যে ফিরে, নাহি তার শেষ।
মাথার সীমন্তে লাল সিন্দুরের রেখা,
চরণেতে দেখি লাল আল্‌তার দেখা।
আবীরের লালে লাল দোলের সময়,
ক্রোধে লাল দুই আঁখি দেখে লাগে ভয়।

প্রবাল বিক্রম চূণী রক্ত আভা ধরে,
সকাল, সন্ধ্যায় দেখি রক্তিমা অম্বরে।
রঙে ক'রেছেন যিনি বিচিত্র এ ধরা,
ভক্তি ভরে করি তাঁরে প্রণতি আমরা।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

নূতন ধাঁধা।

(১)

খ্যাত এক মহাজন সবে জান যাঁরে,
সমভাবে দুই ভাগে কাটিলাম তাঁরে—
একভাগ রসে ভরা বাহিরে কঠিন,
আর ভাগ বিবাহেতে সভায় আসীন!
মুড়ো খ্যাবা ক'রে আরো যদি তারে কাটি
দেখিবে সমাধি এক অতি পরিপাটি॥

(২)

পেট কেটে ছুটে যায় শন্ শন্ তীর,
মুড়ো বাদে একমণ সে কেমন বীর!
দক্ষিণে নাহি পাবে ল্যাজ যদি কাটো,
পূরাপুরি মেপে দেখ অতিশয় খাটো।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর—

১। ঘড়ির দুই কাঁটা।
২। চাদর।

[ধাঁধার উত্তর যাহারা দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম আগামী বারে বাহির হইবে।]

"সেকালের বাদুড়"

সন্দেশ

চতুর্থ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩২৩ | একাদশ সংখ্যা

মা ও ছেলে।

বিছানাতে খোকনেরে থুয়ে,
মা তাহার পাশে শুয়ে শুয়ে
স্নেহরসে উছলিত প্রাণ
ধীরে ধীরে গান স্নেহ-গান।
"ঘুমো যাদু! ঘুমো ওরে ঘুমো"—
ব'লে তা'র চোখে খান্ চুমো।

"মা"—বলিয়া খোকা উঠে জেগে'।
"দুষ্টু ছেলে"—মা বলেন রেগে'
"কস্‌নে কথা চুপ্—তা না হ'লে—"
হেসে' খোকা অম্‌নি উঠে ব'লে,—
"বল তুমি কেমন ক'রে ঘুমাই
চোখে যদি খাও মা শুধু চুমা—ই?"

শ্রীগণেশচন্দ্র রায়।

নিরেট গুরুর কাহিনী।

ঘোড়ায় থেকে পড়ে যাওয়া।

ব্রাহ্মণের ভবিষ্যৎবাণীর পর কিছুদিন গুরু খুবই সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন। জল খাওয়া ছাড়া জলের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই রাখিলেন না। কখন জল পড়িয়া পা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে বলা যায় না ত ? কিন্তু ঘরে বসিয়া বেশীদিন চলে না, কারণ শিষ্য যজমানরা কেহই গুরুর বাড়ী আসিয়া টাকা দিয়া যাইত না। কাজেই গুরুকে আবার ঘর ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে শিষ্য বাড়ী ঘুরিতে আরম্ভ করিতে হইল।

একদিন গুরু ঘোড়ায় চড়িয়া রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন, চেলার দল পিছনে হাঁটিয়া চলিয়াছে। রাস্তার ধারে একটা গাছ ছিল, তার একটা ডাল রাস্তার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। গুরু গাছতলায় আসিবামাত্র তাঁহার পাগড়ীটা ডালের ঠোক্কর লাগিয়া ধূলায় গড়াইয়া পড়িল। গুরু ভাবিলেন, তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ নিশ্চয়ই পাগড়ীটা তুলিয়াছে, অতএব তিনি ঘোড়া না থামাইয়া চলিতেই লাগিলেন। অনেক দুর চলিয়া যাইবার পর তাঁহার হঠাৎ মাথায় রোদ লাগাতে তিনি ঘোড়া থামাইয়া এক শিষ্যকে বলিলেন, "ওহে, আমার পাগড়ীটা দাও ত।" সে খুব নিশ্চিন্ত ভাবে বলিল, "আপনার পাগড়ী ? সেটা ত সেই গাছতলায় পড়ে আছে।" গুরু রাগিয়া বলিলেন, "কোন জিনিষ পড়ে গেলে সেটা কুড়িয়ে আনতে হয় তাও জাননা নাকি ?" হাবা তাড়াতাড়ি সেই গাছতলায় দৌড়িয়া গিয়া পাগড়ীটা কুড়াইয়া লইল। উহা লইয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে সে রাস্তায় আর একটা জিনিষ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিল। জিনিষটা গুরুমহাশয়ের ঘোড়ার বটে তবে তুমি আমি তাহা কুড়াইয়া আনিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিতাম না। কিন্তু হাবার কথা আলাদা, সে হইল গুরু নিরেটের চেলা, সে জিনিষটা কুড়াইয়া লইয়া গুরুর পাগড়ীর উপর রাখিয়া ফিরিয়া চলিল ;—গুরু পড়িয়া গেলে জিনিষ কুড়াইয়া আনিতে বলিয়াছেন যে !

হাবা গুরুর হাতে পাগড়ী দিবামাত্র তিনি ব্যাপার দেখিয়া "আরে ছি ছি" বলিয়া চীৎকার করিয়া পাগড়ীটা দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং হাবাকে খুব বকিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সব কজন শিষ্য তখন একজোট হইয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, "গুরুমহাশয় এ কি ? আপনিই না বলেছিলেন যে রাস্তায় যা কিছু পড়ে যাবে, সব কুড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে ? হাবা ত ঠিক তাইই করেছে, তবে আপনি অত বকছেন

কেন ?" গুরু মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, "বলি, কোন জিনিষটা তুলতে হয় আর কোনটা হয়না তা বুঝবার মত বুদ্ধিও কি তোমাদের ঘটে নেই ?" শিষ্যগণ মুখ হাঁড়ি করিয়া বলিল, "তাই যদি থাকবে তাহলে আর আমরা চেলা হতে এসেছি কিসের জন্য ? নিজেরাই ত এক একজন গুরুমহাশয় হতে পারতাম ? তা আপনি কাগজে লিখে দিন যে কি কি জিনিষ পড়ে গেলে কুড়তে হবে তা হলেই আমরা ঠিক ভাবে কাজ করতে পারব।" গুরু অগত্যা তাহাই করিলেন।

আরও খানিক দূর যাইবার পর আর এক বিপদ ঘটিল। বৃষ্টি হইয়া রাস্তাটা খুব পিছল হইয়াছিল, খোঁড়া ঘোড়াটা পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে গুরুও

মাথা নীচের দিকে আর পা উপর দিকে করিয়া এক ডিগ্‌বাজী খাইয়া রাস্তার পাশে এক গর্ত্তে পড়িয়া গেলেন। তিনি সেইখান হইতেই "ওরে বাবারে, গেলুম রে, আমাকে

শিগ্‌গির তোলরে," বলিয়া চেঁচাইতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যেরা তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া গিয়া গর্ত্তের ধারে হাজির হইল। একজন সেই কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল, "পাগড়ী পড়িয়া গেলে তুলিতে হইবে, কাপড় পড়িয়া গেলে তুলিতে হইবে, চাদর পড়িয়া গেলে তুলিতে হইবে, জামা পড়িয়া গেলে তুলিতে হইবে," ইত্যাদি, এবং বাকী কজন চট্‌পট্ গুরুর জামা কাপড় প্রভৃতি গর্ত্ত হইতে তুলিতে আরম্ভ করিল, বাকী রহিলেন কেবল গুরু নিজে। তিনি যতই চীৎকার করেন, "ওরে আগে আমাকে তোল," বুদ্ধিমান চেলারা ততই মাথা নাড়ে, আর বলে, "আপনাকে তোলবার কথা ত কাগজে লেখা নেই। যা লেখা নেই তা আমরা কিছুতেই করছি না, আবার গাল খাই আর কি!" শত চীৎকারে আর বকুনিতেও যখন কিছু হইল না, তখন গুরু তাহাদিগের নিকট হইতে কাগজখানা চাহিয়া লইলেন, আর সেই গর্ত্তের ভিতর বসিয়াই লিখিলেন "আমি যদি পড়িয়া যাই, তাহা হইলে আমাকেও তুলিতে হইবে"।

কাগজখানা হাতে পাইবামাত্রই পাঁচ শিষ্য একসঙ্গে ছুটিয়া গিয়া গুরুকে টানিয়া তুলিল। গুরুর তখন যা অবস্থা! সমস্ত শরীর কাদায় আর ময়লায় ভরিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে কিছু দূরেই একটি পুকুর ছিল, সেইখানে গিয়া তিনি স্নান করিয়া আবার কাপড় চোপড় পরিলেন। তখন চেলারা তাঁহাকে আবার ঘোড়ায় চড়াইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। তাহাদের যে কত বুদ্ধি সেই বিষয়ে গল্প করিতে করিতে শীঘ্রই তাহারা সকলে বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ।

(পদ্মপুরাণ)

যজ্ঞীয় অশ্ব কুণ্ডলনগর হইতে বাহির হইয়া কত রাজার দেশ ঘুরিয়া বেড়াইল, কেহই তাহাকে ধরিতে সাহসী হইল না। অবশেষে একদিন প্রাতঃকালে অশ্ব গঙ্গার তীরবর্ত্তী বাল্মীকি মুনি আশ্রমে গিয়া উপস্থিত।

সীতার বনবাসের সময় তিনি বাল্মীকি মুনির আশ্রমে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহার দুইটি যমজ পুত্র জন্মিয়াছিল—বাল্মীকি তাহাদের নাম রাখিলেন লব আর কুশ। তাঁহারই যত্নে এবং শিক্ষার গুণে লব কুশ বড় হইয়া সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত এবং মহা

ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিল। বাল্মীকিদত্ত অভেদ্য ধনু হাতে লইয়া, পিঠে অক্ষয় তূণ ঝুলাইয়া দুটি ভাই ঋষিকুমারদিগের সহিত বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত। যজ্ঞীয় অশ্ব বাল্মীকি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র লব তাহাকে দেখিয়া ভারী আশ্চর্য্য হইল। এমন সুন্দর সজ্জিত অশ্ব কোথা হইতে আসিল? এটি কাহার অশ্ব? লব অশ্বের নিকটে গিয়া দেখিল তাহার কপালে একখানা পত্র ঝুলিতেছে, তখন পত্রখানি লইয়া পড়িবামাত্র লব ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল—"কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমরা কি ক্ষত্রিয় সন্তান নই? আমরা কি যুদ্ধ জানি না? রাম কে? শত্রুঘ্নই বা কে? আমি এই অশ্ব বাঁধিব।" মুনিবালকেরা রামের শক্তি সামর্থ্যের কথা বলিয়া তাহাকে অনেক বারণ করিল কিন্তু লব তাহাদের বাধা অগ্রাহ্য করিয়া অশ্বকে ধরিল। শত্রুঘ্নের অনুচরগণ অশ্ব উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিলে পর লব বাণ দ্বারা তাহাদের হাত কাটিয়া ফেলিলেন। তখন ছিন্নবাহু অনুচরেরা যাতনায় চীৎকার করিতে করিতে শত্রুঘ্নের নিকট গিয়া উপস্থিত।

অনুচরগণের দুরবস্থা দেখিয়া শত্রুঘ্নের রাগ হইবার ত কথাই! তিনি তখনি তাঁহার সেনাপতি কালজিৎকে হুকুম করিলেন, সেনাপতিও সৈন্য লইয়া লবের নিকটে গিয়া উপস্থিত। তাহাকে বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না, লবের বাণে সৈন্যগণ ত মরিলই সঙ্গে সঙ্গে কালজিৎও মারা গেল। তখন পুষ্কল মহা ক্রুদ্ধ হইয়া লবকে মারিতে চলিলেন। লবকে মাটিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পুষ্কল প্রথমেই তাহাকে রথ দিতে চাহিলেন, তাহাতে লব বলিল—"তোমার দেওয়া রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিব কেন? ভাবনা কি! আমি এখনি তোমাকে রথশূন্য করিতেছি, তারপর তুমিও মাটিতে দাঁড়াইয়াই যুদ্ধ করিও।" এই বলিয়া লব চক্ষের নিমেষে পুষ্কলের হাতের ধনু কাটিয়া ফেলিল। অন্য ধনু হাতে লইয়া পুষ্কল গুণ পরাইতে যাইবেন সেই অবসরে লব তাঁহার রথখানিও কাটিয়া ফেলিয়াছে! পুষ্কল তখন মাটিতে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কেহই কম যোদ্ধা নয়, কত বাণ যে উভয়ে উভয়কে মারিল তাহার সীমাই নাই; বাণের আঘাতে দুজনেরই কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শরীরে রক্তের ধারা বহিল। শেষে লব এমনি ভয়ঙ্কর এক বাণ মারিল যে পুষ্কল কিছুতেই তাহা কাটিতে পারিলেন না, বাণ তাঁহার বুকে গিয়া বিন্ধিল—তিনি মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

ইহা দেখিয়া হনূমান প্রকাণ্ড একটা শিমুল গাছ লইয়া লবকে মারিতে উদ্যত হইলে লব তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। ইহার পর হনূমান যে গাছ লয় লব তাহাই কাটিয়া ফেলে। হনূমান যত পাহাড় পর্ব্বত ছুঁড়িতে লাগিল, লবের বাণে সব চুরমার।

মহা ক্রোধে হনূমান তখন তাহাকে লাঙ্গুল দিয়া জড়াইয়া ধরিল। লবের তাহাতে ভয় পাওয়ার কোন কথাই নাই; সে জননী সীতা দেবীকে স্মরণ করিয়া বানরের লেজে এমনি এক কিল মারিল যে বাছা হনূমান তাহাকে ছাড়িয়া না দিয়া আর করে কি! তার পর লব বাণের পর বাণ মারিয়া হনূমানকে একেবারে অস্থির করিয়া দিল। পলায়ন করিলে লজ্জার সীমা থাকিবে না আবার প্রহারই বা কত সহ্য করিবে? নিতান্ত নিরুপায় হইয়া হনূমান ভাবিল,—"ব্রহ্মার বরে আমার ত মরণ নাই কাজেই এখন কপট মূর্চ্ছা দেখাইয়া শুইয়া পড়ি।" এই ভাবিয়া হনূমান রণক্ষেত্রে কপট মূর্চ্ছা দেখাইয়া শয়ন করিল।

হনূমান মূর্চ্ছিত হইলে পর ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া শত্রুঘ্ন আসিলেন যুদ্ধ করিতে। লবের নিকটে আসিয়াই দেখিলেন ঠিক যেন রাম শিশুমূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এ শিশু নিশ্চয় সীতা দেবীর সন্তান। কিন্তু এ সকল চিন্তা করিবার আর বেশী অবসর পাইলেন না, লবের সম্মুখে আসিবা মাত্র তাহার হাজার হাজার তীক্ষ্ণ বাণ তাঁহার শরীরে বিন্ধিল। তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বালক হইলে কি হয়, লবের বাণগুলি সাংঘাতিক। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে শত্রুঘ্নকে মহা ব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাঁহার ধনু কাটিয়া, রথ কাটিয়া বর্ম্ম কাটিল, অবশেষে তাঁহার মাথার মুকুটও কাটিয়া ফেলিল। শেষে লবের দারুণ একটি বাণের আঘাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর শত্রুঘ্নের দারুণ ক্রোধ হইল, তাঁহার চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। যে বাণ মারিয়া লবণাসুরকে বধ করিয়াছিলেন তিনি তখন সেই মহা ভয়ঙ্কর বাণ ধনুকে জুড়িলেন। বাণের আগুনে চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শত্রুঘ্ন বাণ ছাড়িলেন, লব কিছুতেই তাহা নিবারণ করিতে পারিল না। তাহার বুকে আসিয়া বাণ বিদ্ধ হওয়া মাত্র সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ইহা দেখিয়া মুনিবালকেরা কান্দিতে কান্দিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়া সীতা দেবীকে সমস্ত সংবাদ জানাইল। এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া সীতা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কুশ মহাদেবের পূজা করিয়া বর লইবার জন্য দূরদেশে গিয়াছিল। ঠিক এই সময়ে সেও আসিয়া উপস্থিত। সে ত আর এ সব কথা কিছু জানিত না কাজেই সীতা দেবীকে এরূপ শোক করিতে দেখিয়া সে ভারী আশ্চর্য্য হইয়া মুনিবালকদিগকে ইহার কারণ

জিজ্ঞাসা করিল। তাহাদিগের মুখে সব শুনিয়া কুশের দুঃখও হইল, রাগও হইল। মাকে বলিল—"মা! কেন তুমি দুঃখ করিতেছ? এই যে আমি আসিয়াছি—এখনি আমি ভাই লবকে উদ্ধার করিব।" এইরূপে জননীকে শান্ত করিয়াই কুশ অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত।

ততক্ষণে লবেরও জ্ঞান হইয়াছে। সম্মুখে কুশকে দেখিবামাত্র সে এক লাফে শত্রুঘ্নের রথ হইতে মাটিতে পড়িয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত। তখন দুই ভাই মিলিয়া মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কুশ পূর্ব্বে লব পশ্চিমে, মধ্যখানে শত্রুঘ্নের সৈন্যদল, মনে হইল যেন তাহাদের আর এ যাত্রা নিস্তার নাই। প্রথমে শত্রুঘ্ন কুশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কুশ লবের চাইতেও নিপুণ; শত্রুঘ্ন কত রকম বাণ মারিলেন সে হাসিতে হাসিতে সমস্ত কাটিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে নারায়ণাস্ত্র মারিল। এই মহা ভয়ঙ্কর অস্ত্র শত্রুঘ্নের কিছুই করিতে পারিল না দেখিয়া কুশ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"আপনি নারায়ণ অস্ত্রকেও ব্যর্থ করিলেন, কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এখন আমি তিনটি বাণ মারিয়া আপনাকে জয় করিব—আপনি সাবধান হউন।" এই বলিয়া কুশ আগুনের মত উজ্জ্বল এক অস্ত্র মারিল, শত্রুঘ্ন রাম নাম স্মরণ করিয়া সেটিকে কাটিলেন। কুশ দ্বিতীয় অস্ত্র মারিল তাহাও শত্রুঘ্নের বাণে দুই ভাগ হইয়া গেল। কিন্তু কুশের তৃতীয় বাণকে শত্রুঘ্ন কোন রকমেই ব্যর্থ করিতে না পারায় সে বাণের আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হইলেন।

শত্রুঘ্ন অজ্ঞান হইলে পর রাজা সুরথ আসিলেন যুদ্ধ করিতে। কিন্তু কুশের সঙ্গে তিনি কিছুতেই পারিয়া উঠিলেন না। তাহার এক ভীষণ বাণ খাইয়া তিনিও অজ্ঞান হইলেন। তখন হনুমান রাগে দাঁত কড়মড় করিতে করিতে আসিয়া কুশকে আক্রমণ করিল। দুইজনে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত দারুণ সংগ্রাম করিলে পর কুশ সংহারাস্ত্র মারিয়া হনুমানকে যখন বাঁধিয়া ফেলিল তখন আসিল সুগ্রীব। কিন্তু সুগ্রীব কুশের সঙ্গে কতক্ষণ পারিবে! কুশের বারুণ-পাশে তাহারও হনুমানের দশা হইল।

এদিকে লবও পুষ্কল, অঙ্গদ, বীরমণি প্রভৃতি বীরগণকে পরাজয় করিয়া কুশের নিকটে আসিয়া উপস্থিত। এত বড় বড় যোদ্ধাদিগকে পরাজয় করিয়া তখন দুই ভাইয়ের আনন্দ দেখে কে! তাহারা শত্রুঘ্ন এবং পুষ্কলের সুন্দর মুকুট এবং অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া হনুমান এবং সুগ্রীবের লেজ ধরিয়া টানিতে টানিতে মায়ের কাছে চলিল।

লব কুশকে দেখিয়া সীতা দেবীর কি যে আহ্লাদ হইল! তিনি ছুটিয়া আসিয়া দুই ভাইকে বুকে লইয়া কত আদর করিলেন। পরে যখন হনূমান ও সুগ্রীবের প্রতি তাঁহার নজর পড়িল, তখন তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! হায়, হায়, তোমরা এ কি করিয়াছ? শীঘ্র ইহাদের বাঁধন খুলিয়া দাও। জান না, এ যে হনূমান আর সুগ্রীব! রাবণের লঙ্কা পোড়াইয়া ছারখার করিয়াছিল এ সেই মহাবীর হনূমান—আর ইনি বানররাজ সুগ্রীব। ইহাদিগকে তোমরা কোথায় পাইলে?" জানকীর কথা শুনিয়া লব কুশ আদ্যোপান্ত সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। তখন সীতা দেবীর কি যে দুঃখ! তিনি লব কুশকে বলিলেন—"সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্ বাবা! হায়, হায়, কি উপায় হইবে! এ যে তোমাদের পিতা রামচন্দ্রের অশ্ব ধরিয়াছ! শীঘ্র উহাকে ছাড়িয়া দাও এবং রামচন্দ্রের ভ্রাতা শত্রুঘ্নের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" সীতাদেবী তখন করযোড়ে সূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"হে প্রভু! আপনি দয়া করিয়া শত্রুঘ্ন প্রভৃতি বীরগণকে জীবিত করুন।" সূর্য্যদেব জানকীর প্রার্থনা শুনিলেন, রণক্ষেত্রে সমুদায় বীরগণ জীবন পাইল। তখন সৈন্যগণের সহিত শত্রুঘ্ন ফিরিয়া চলিলেন—বিজয়ী অশ্ব আগে আগে চলিল। অশ্ব লইয়া সকলে অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলে পর রামচন্দ্র অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর করিলেন।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়।

আমরা কথায় বলি "আকাশের মত নীল"। বাস্তবিক কিন্তু আকাশের কোন রং নাই। আমরা যাকে 'আকাশ' বলি সেটাত কেবল ফাঁকা আকাশ মাত্র নয়, তার মধ্যে পৃথিবীর বাতাস আর ধূলো বালি কত কিছু আছে। আমরা যে নীল দেখি, আর সকাল সন্ধ্যায় জমকালো রঙের ঘটা দেখি, এ সমস্তের কারণ ঐ ধূলা। ধূলা আর বাতাস যদি না থাকত আর আকাশটা সত্যসত্যই একেবারে ফাঁকা আকাশ হ'ত, তা হ'লে সেটাকে দেখাত একেবারে ঘুট্‌ঘুটে কালো। তার মধ্য থেকে চন্দ্রসূর্য্য তারা সব দিনদুপরে ঝক্‌ঝক্ করত।

নীহারিকা।

তোমরা আকাশে "কালপুরুষ" দেখিয়াছ ? আজকাল, অর্থাৎ এই ফাল্গুন মাসে, প্রথম রাত্রে যদি দক্ষিণমুখী হইয়া দাঁড়াও, তবে প্রায় মাথার উপর এই "কাল পুরুষ" কে দেখিতে পাইবে, আর একবারটি যদি তাহাকে চিনিয়া রাখ, তবে আর কোন দিন ভুলিবে না।

পৃথিবীর যেমন মানচিত্র বা "ম্যাপ্" হয়, আকাশেরও তেমনি মানচিত্র আছে। এই রকমের অনেক মানচিত্রে আকাশের তারার সঙ্গে অনেক অদ্ভুত ছবি আঁকা থাকে ; তাহার মধ্যে যদি কালপুরুষ বা Orion এর ছবি খুঁজিতে যাও, তবে হয়ত দেখিবে একটা হাত-পা-শুদ্ধ মূর্ত্তি আঁকা আছে, কিন্তু আকাশে খুঁজিলে অবশ্য সেরকম কোন চেহারা পাইবে না—দেখিবে কেবল ঐ তারাগুলি।

আকাশের গায়ে যে এত হাজার হাজার তারা ছড়ান রহিয়াছে, মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাহার মধ্যে নানারকম ছবি ও মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া আসিতেছে।

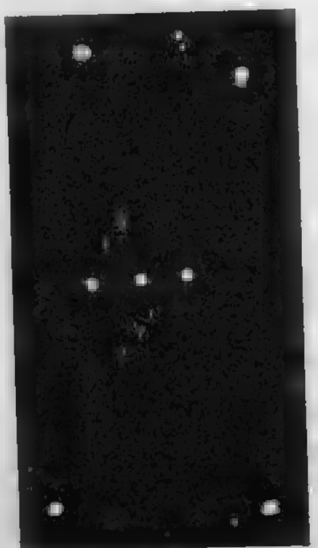

কতগুলা তারা মিলিয়া হয়ত অর্দ্ধচন্দ্রের মত দেখায়, মানুষে বলিল "ওটা ধনুকের মত ;" কোনটা হয়ত মুকুট, কোনটা ষাঁড়ের মাথা, কোনটা ভাল্লুক, কোনটা যমজ ভাই, কোনটা যোদ্ধা, এইরূপ নানারকম কল্পনার মূর্ত্তিতে সমস্ত আকাশটিকে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক সময়েই এ সকল কল্পনাকে নিতান্তই আজগুবি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই কালপুরুষের বেলা বোধ হয় কল্পনাটা বেশ খাটিয়াছে। দুই হাত দুই পা আর মাথা সবই মিলিতেছে, তার উপর আবার কোমর বন্ধ ! তলোয়ারটি পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই ! এত কথা যে বলিলাম সে কেবল ঐ তলোয়ারটির জন্য। ঐ 'তলোয়ার'টার দিকে একবার ভাল করিয়া দেখ দেখি ; তিনটি তারার মধ্যে মাঝেরটি একটু কেমন কেমন দেখায় না ? আর সবগুলি তারা পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে হীরার টুকরার মত, কিন্তু এটা যেন কেমন একটু ঝাপসা ঠেকে। শুধু চোখে এই

পর্য্যন্ত; কিন্তু দূরবীণ দিয়া দেখ, আরও তফাৎ দেখিবে। যত বড়ই দূরবীণ কষ না কেন, আর সব তারাগুলিকে কেবলি ঝিকমিকে হীরার মত দেখিবে, কিন্তু এই "তারা"টিকে দেখিবে যেন সাদা মেঘের মত। আকাশে এই রকম মেঘের মত জিনিম আরও অনেক দেখা যায়—ইহাদের নাম নীহারিকা, ইংরাজিতে বলে Nebula.

পণ্ডিতেরা বলেন এই নীহারিকাগুলা এককালে তারা হইবে এবং এই তারাগুলাও এককালে নীহারিকা ছিল। আমরা যাহাকে সৌরজগৎ বলি—এই সূর্য্য এবং গ্রহ উপগ্রহশুদ্ধ তাহার বিশাল পরিবারটি—এ সমস্তই এককালে কোন এক প্রকাণ্ড নীহারিকার মধ্যে খিচুড়ি পাকাইয়া ছিল। সে যে কত বড় ব্যাপার তাহা কল্পনাও করা যায় না। সেই নীহারিকা আকাশের একটা প্রকাণ্ড কোণ জুড়িয়া জ্বলন্ত বাষ্পের মত দপ্‌দপ্ করিয়া জ্বলিত। তাহার মধ্যে না ছিল চন্দ্রসূর্য্য, না ছিল পৃথিবী।

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কাহারও স্থির হইয়া থাকিবার নিয়ম নাই, একটা কণাপ্রমাণ বস্তু আর একটি কণাকে পাইলে এ উহাকে টানিয়া লয়, দশটা কণা একত্র হইলেই পরস্পরের দিকে ছুটিয়া জমাট বাঁধিতে চায়। সুতরাং এত বড় নীহারিকাটি যে স্থির হইয়া থাকিবে, এমন কোন উপায় ছিল না—সে আপনার ভিতরকার টানাটানির মধ্যে পড়িয়া ঘোরপাক খাইতে লাগিল আর তাহার মধ্যখানে প্রকাণ্ড একটা বাষ্পের ঢিপি জমাট হইতে লাগিল। এই জমাট ঢিপিকেই এখন আমরা সূর্য্য বলি।

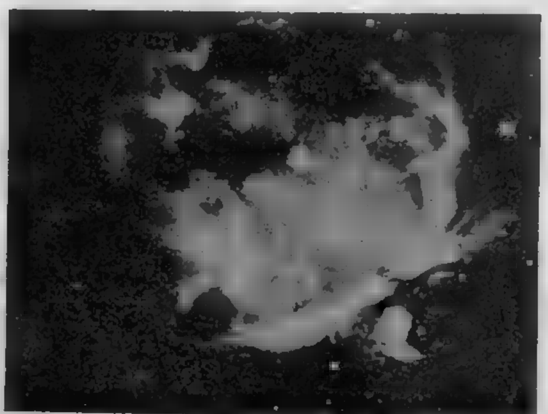

কালপুরুষের নীহারিকার ছবিটা একবার দেখ—ঐ জমাট মেঘের মত জিনিষটার ভিতর হইতে কত ডালপালা বাহির হইয়াছে; ঐ ডালপালাগুলি আবার আলগাভাবে জমাট বাঁধিয়া গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি করিবে। ঘুরন্ত চাকার গা হইতে যেমন করিয়া কাদা ছিটকাইয়া যায়, এক একটা নীহারিকার চক্র হইতে ঠিক যেন সেই রকম জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। দেখিতে অবশ্য সমস্ত

নীহারিকাটি স্থির দেখা যায়—কারণ জিনিষটা এত দূরে যে ঘণ্টায় লক্ষ মাইল বেগে ছুটিলেও এখান হইতে তাহাকে একেবারে স্তব্ধ দেখা যাইবে!

এই আর একটা নীহারিকার ফটোগ্রাফ দেখ। ইহার মধ্যে ঐ জমাটবাঁধা আর ছড়াইয়া পড়ার ব্যাপারটা আরও সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। ছবিতে জিনিষটাকে "জিবে গজার" মত লম্বা দেখিতেছ, কিন্তু আসলে জিনিষটি প্রায় থালার মত গোল—আমরা তাহার কাণার দিক হইতে ট্যারচা-ভাবে দেখিতে পাই, তাই ঐ রকম লম্বাটে দেখি। মাঝের ঐ ঘন উজ্জ্বল জিনিষটুকু এককালে, হয়ত কোটি কোটি বৎসর পরে, সূর্য্যের মত একটি আগুণের গোলা লইয়া দাঁড়াইবে। আর ঐ যে দুপাশে দুটি ছোটখাট ডেলার মত দেখিতেছ, উহার মধ্যে একটি ঘূর্ণিপাকে ঘুরিতেছে—ভবিষ্যতে সে "গ্রহ" হইয়া থাকিবে; আর একটি ঐ ঘূর্ণীর বাহিরে পড়িয়াছে, সেও হয়ত একটি ছোট্ট সূর্য্য হইয়া কিছুকাল,

অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বৎসর, আলো দিয়া তারপর নিভিয়া যাইবে। জ্বলন্ত ধোঁয়ার ঘূর্ণী ক্রমেই ঝাপসা হইয়া কতদূর পর্য্যন্ত ডালপালা ছড়াইয়াছে—সেগুলিও হয়ত আরও কত জায়গায় জমাট বাঁধিয়া আরও কত ছোটখাট গ্রহের সৃষ্টি করিবে।

আকাশে এই রকম নীহারিকা কত যে আছে, তাহার আর অন্ত নাই। কোনটা একেবারে ঝাপসা কুয়াশার মত, কোনটার মধ্যে সবে একটু জমাট বাঁধিতেছে, কোনটা রীতিমত গোলা পাকাইয়া উঠিতেছে। এক একটার চেহারা ঠিক যেন ঘুরন্ত চরকী

বাজির মত, মনে হয় যেন জ্বলন্ত চক্র হইতে আগুণ ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। আবার এমন নীহারিকাও আছে যাহাকে এখন দেখিতে ঠিক তারার মতই দেখায়; সে যে এক সময়ে নীহারিকা ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ এখনও তাহার আশে পাশে অতি ঝাপসা কুয়াশার মত নীহারিকার শেষ নিঃশ্বাসটুকু লাগিয়া আছে। সে এত ঝাপসা যে অনেক সময় খুব বড় দূরবীক্ষণ দিয়াও তাহার কিছু মাত্র ধরা যায় না,—ধরা পড়ে কেবল ফটোগ্রাফের প্লেটে!

ফটোগ্রাফের প্লেটে কেমন করিয়া ছবি তোলে দেখিয়াছ ত? ক্যামেরার ভিতর হইতে সে টুক্ করিয়া একটিবার মাত্র তোমার দিকে তাকায় আর ঐ একদৃষ্টিতেই তোমার চেহারার ছাপটুকু নিজের মধ্যে ধরিয়া লয়। সে একবার যাহা ভাল করিয়া ধরে তাহা আর ভুলিতে চায় না। এক মিনিট খুব ঝাপসা জিনিষের দিকে তাকাইলে মানুষের চোখ শ্রান্ত হইয়া পড়ে—সে তখন আর ভাল দেখে না; কিন্তু ফটোগ্রাফের প্লেট যত বেশী করিয়া তাকায় ততই বেশী দেখিতে পায়। এমনি করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাইয়া, সে ঐ অন্ধকারের মধ্যেই অনেক আশ্চর্য্য জিনিষের সংবাদ বাহির করে। এই রকম ফটোগ্রাফ দেখিলে বোঝা যায় যে সমস্ত আকাশটাই প্রায় নীহারিকায় ঢাকা—আকাশের যে দিকে তাকাও সেই দিকেই নীহারিকার জাল।

তিন বন্ধু।

(২)

বাড়ীর চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে তারা খাবার ঘরে এসে উপস্থিত। সেখানে চার জনের জন্য নানারকম সুন্দর খাবার সাজান রয়েছে দেখে তারা পেট ভরে খেয়ে নিল। তারপর তারা শোবার জোগাড় দেখবে ব'লে উঠ্‌তে যাচ্ছে—এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলে গেল আর একটা বুড়ো, কুঁজো, বিদ্‌ঘুটে, এয়া লম্বা পাকাদাড়িওয়ালা লোক, একটি অতি সুন্দর রাজকন্যার হাতে ধ'রে ঘরে ঢুক্‌ল। রাজপুত্রকে দেখেই বুড়ো লোকটা বল্‌ল, "বাপু হে, সব জানি আমি! রাজকন্যাকে তো নিতে চাচ্ছ, কিন্তু তিনটি রাত যদি তাকে রক্ষা করতে পার,—তার আগে যদি সে হারিয়ে না যায়,—তবেই তাকে পাবে; নইলে এই এত গুলি লোকের মত তুমিও পাথর হয়ে যাবে।" এই বলে সে রাজকন্যাকে একটা চৌকিতে বসিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

রাজপুত্রতো মেয়েটিকে দেখে বড় খুসী। সে তাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু মেয়েটি কিছুই বলে না;—হাসেও না। তারপর যখন রাত বেশী হয়ে এলো তখন ঢেঙারাম লম্বা হয়ে ঘরের চারিদিকে ঘিরে রইল; তোঁদারাম এয়া মোটা হয়ে ফুলে তার পেট দিয়ে দরজার ছেঁদা বন্ধ ক'রে রইল, যাতে একটি ইঁদুরও না ঢুক্‌তে বা পালাতে পারে; আর আগুণে-চোখ চারদিকে খুব হুসিয়ার হয়ে তদ্বির করতে লাগ্‌ল।

কিন্তু সকলেই বড় ক্লান্ত হয়েছিল; তাই কিছুক্ষণ পরে সকলেই খুব নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে লাগ্‌ল। ভোরের বেলা রাজপুত্রেরই আগে ঘুম ভেঙে গেল, আর সে দেখ্‌ল যে রাজকন্যা ঘরে নাই। তখন যে তার দুঃখটা হ'লো! সে তাড়াতাড়ি আর তিনজনকে জাগিয়ে দিল, আর তখন কি করতে হবে জিজ্ঞাসা করল।

আগুণে-চোখ বল্‌ল, "ভয় কিসের? ঐ যে আমি তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি। এখান থেকে একশ' মাইল দূরে একটা বন আছে। সেই বনে একটা আম গাছ আছে; তাতে একটি আম ফ'লেছে; তারই আঁঠিটি হচ্ছে সেই রাজকন্যা। ঢেঙারাম আমাকে কাঁধে নিয়ে চলুক; আমরা এখনই তাকে আন্‌ছি।"

অমনি ঢেঙারাম আর কথাবার্ত্তা না ব'লে আগুণে-চোখকে কাঁধে তুলে নিল, আর দশ মাইল লম্বা এক এক পা ফেলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হ'লো। তারপর আমের আঁঠি আন্‌তে আর কতক্ষণ লাগে!

সেই আঁঠিটি রাজপুত্রের হাতে দিয়ে আগুনে-চোখ বল্‌ল, "এটাকে মাটিতে ছুঁড়ে মার।" আর রাজপুত্রও কথামত কাজ করা মাত্র রাজকন্যা এসে হাজির!

সূর্য্য উঠ্‌বার একটু পরেই সেই বুড়ো হাস্‌তে হাস্‌তে এসে, দড়াম্ ক'রে দরজা খুলে ঘরে ঢুক্‌ল; কিন্তু সেখানে রাজকন্যাকে দেখে বেচারা এমন চম্‌কে গেল যে আরেকটু হ'লেই সে প'ড়ে যেতো। তারপর রাগে গজ্‌গজ্ কর্‌তে কর্‌তে সে রাজকন্যাকে নিয়ে চ'লে গেল।

সে দিন সন্ধ্যায় আবার বুড়ো এসে রাজকন্যাকে রেখে গেল। রাজপুত্র আর তিন বন্ধু সে রাত্রে জেগে থাক্‌বার জন্য খুবই চেস্টা করেছিল, কিন্তু দুপুর রাত্রের আগেই সকলে ঘুমিয়ে নাক ডাকাতে আরম্ভ কর্‌ল। ভোরের বেলা রাজপুত্র আগে জেগে যাই দেখ্‌ল রাজকন্যা নাই, অমনি অস্থির হ'য়ে তাড়াতাড়ী তিন বন্ধুকে জাগিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "আগুণে-চোখ! শীগ্‌গির দেখ, রাজকন্যা কোথায় গেল। সকাল যে হয়ে এল!"

আগুণে-চোখ জেগে উঠে চোখ রগ্‌ড়িয়ে বল্‌ল, "এই যে আমি তাকে দেখ্‌ছি। এখান থেকে দুইশ' মাইল দূরে একটা পাহাড় আছে; সেই পাহাড়ের মধ্যিখানে একটা পাথর আছে; সেইটিই হ'লো রাজকন্যা। ঢেঙারাম যদি আমায় নিয়ে যায় তবে এখনি আমি রাজকন্যাকে আনব।"

যেমন কথা তেম্‌নি কাজ। ঢেঙারাম তখনই আগুণে-চোখকে কাঁধে নিয়ে কুড়ি মাইল লম্বা এক এক পা ফেলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সেখানে হাজির হ'লো। আগুনে-চোখ

সেই পাহাড়ের দিকে কট্‌মট্ ক'রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সেই পাহাড়টাকে ফাটিয়ে

গুঁড়িয়ে দিল, আর তার ভিতর থেকে সেই পাথরটা বেরিয়ে পড়ল। সেটাকে নিয়ে রাজপুত্রের কাছে দিতেই, রাজপুত্র পাথরটা মাটিতে ফেলে দিল, আর রাজকন্যা এসে হাজির হ'লো!

সেদিন বুড়ো এসে রাজকন্যাকে দেখে যা চটে গেল, কি আর বল্‌ব! দুই হাতে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে বল্‌ল, "আজ রাত্রে দেখ্‌ব, তোর বেশী ক্ষমতা না আমার বেশী ক্ষমতা! হয় তুই মর্‌বি না হয় আমি মর্‌ব।"

সে রাত্রেও রাজপুত্র আর তিন বন্ধু রাজকন্যাকে পাহারা দিতে লাগ্‌ল, কিন্তু সেদিনও দুপুর রাতের আগেই সকলে ঘুমিয়ে পড়ল, আর রাজকন্যাও কোথায় জানি হারিয়ে গেল। ভোরের বেলা রাজপুত্র জেগে যাই দেখ্‌ল রাজকন্যা নাই, অমনি সে আগুণে-চোখকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "শীগ্‌গির দেখ রাজকন্যা কোথায় গেল!"

আগুণে-চোখ কিছুক্ষণ চারিদিকে তাকিয়ে তারপর বল্ল, "এবার তাকে দেখেছি! ঐ যে তিন শ' মাইল দূরে কালো জলের সাগর আছে; তার মাঝখানে, জলের তলায় একটা শামুক আছে; সেই শামুকের মধ্যে একটা আংটি আছে; সেটিই রাজকন্যা। এখনও চেষ্টা করলে আমি আর ভোঁদারাম ঢেঙারামের ঘাড়ে চড়ে সেখানে গিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার ক'রে আন্‌তে পারি।"

এ কথা বলা মাত্র ঢেঙারাম, আগুণে-চোখ আর ভোঁদারামকে কাঁধে নিয়ে, ত্রিশ মাইল লম্বা এক এক পা ফেলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে গিয়ে সেখানে হাজির হ'লো। তারপর ভোঁদারাম নিজের শরীরটি ফুলিয়ে পাহাড়ের চেয়ে বড় করে, চোঁ চোঁ শব্দে সাগরের জল খেতে আরম্ভ করলে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে জল এত কম হয়ে গেল যে ঢেঙারাম অনায়াসে শামুকটা তুলে এনে তার ভিতর থেকে আংটিটি বার ক'রে নিল।

এদিকে রাজপুত্র তো বড়ই অস্থির হয়ে পড়ল। সকাল হয়ে গেল, তবু তিন বন্ধু ফেরেই না। এমন সময় সেই বুড়ো হাস্‌তে হাস্‌তে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল; কিন্তু কোন কথা বলার আগেই ঠন্ করে জানালার কাঁচ ভেঙে সেই আংটিটা এসে ঘরে পড়ল, আর রাজকন্যা উঠে দাঁড়াল। আগুণে-চোখ সেই তিনশ' মাইল দূর থেকে সব দেখতে পেয়েছিল আর তাই সে ঢেঙারামকে আংটিটা ছুঁড়ে দেবার কথা বলেছিল। ঢেঙারামও প্রকাণ্ড লম্বা হাত বের ক'রে আংটিটাকে সাঁই ক'রে ছুঁড়ে ঠিক ঘরের ভিতরেই ফেলে দিল, আর রাজপুত্রও বেঁচে গেল।

বুড়ো বেচারার যা তখন দুরবস্থা! তার চোখ কপালে উঠে গেছে, দাঁতে দাঁতে লেগে গেছে, আর থর্‌থর্ করে কাপ্‌ছে। কিছুক্ষণ পরে সে ধোঁয়া হয়ে গেল, আর একটা দাঁড়কাক সেই ধোঁয়া থেকে বেরিয়ে 'কা-কা' কর্‌তে কর্‌তে উঠে চ'লে গেল। সে বাড়ীর যত লোকজন পাথর হয়ে ছিল তারাও তখন বেঁচে উঠে রাজপুত্রের কাছে এসে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াল।

তারপর সকলকে নিয়ে রাজপুত্র খুব ধূমধাম ক'রে বাড়ী ফিরে এল। সেখানে বুড়ো রাজার আর দেশশুদ্ধ লোকের যা আনন্দ!

তিন বন্ধু কিন্তু রাজপুত্রের দেশে ফির্‌ল না; তারা সেই জঙ্গলেই ফিরে গেল, রাজপুত্র ত কত সাধাসাধি কর্‌ল, কিন্তু তারা আর কিছুতেই যেতে রাজি হ'লো না।

মায়া দুর্গ।

(মূর দেশের গল্প)

মূর জাতি যখন প্রবলপরাক্রান্ত ছিল, এবং স্পেন দেশ পর্য্যন্ত মুসলমানের আধিপত্য ছিল, সেই সময়ে উত্তর স্পেইনে একজন ভারী জবরদস্ত মুসলমান যাদুকর ছিল তার নাম আট্‌লান্‌টিস্। গভীর বনের মধ্যে পর্ব্বত গহ্বরে বৃদ্ধ আট্‌লান্‌টিস্ তার যাদুর পুঁথি পত্র নিয়ে নির্জ্জনে বাস করত—সংসারের প্রতি তার কোন একটা মায়া মমতা কিছু ছিল না। দুনিয়ায় আপনার বলতে তার একজন মাত্র ছিল—সেটি তার ভাইপো রোজার। রোজার সম্ভ্রান্ত রাজবংশের ছেলে, অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে খুড়ো আট্‌লাণ্টিসের কাছেই এসে সে আশ্রয় নেয়। বৃদ্ধ আট্‌লান্‌টিসও তাকে এমন ভালবাসত যে মুহূর্ত্তের জন্যও সে তাকে চোখের আড়াল করতে পারত না।

একদিন সে মন্ত্রের পুঁথি নিয়ে গণনা করতে করতে হঠাৎ জান্‌তে পারল যে তার এত আদরের রোজার বড় হয়ে তাকে ছেড়ে চলে যাবে এবং ভারী জবরদস্ত যোদ্ধা হয়ে সে পৃথিবীতে অনেক যশ উপার্জ্জন করবে। বৃদ্ধ যাদুকর তখন ক্ষেপে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করল—"কিছুতেই তা হতে দিব না। দেখা যাবে—রোজারের ভাগ্য আর আমার যাদুবিদ্যা এ দুয়ের মধ্যে কোনটার জয় হয়।"

আট্‌লাণ্টিস্ সেই রাত্রেই ভয়ঙ্কর উঁচু একটা পাহাড়ের উপরে মন্ত্রবলে আশ্চর্য্য এক দুর্গ প্রস্তুত করল। দুর্গের চারিদিক ইস্পাতের উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা—বাড়ী ঘর যা